

পিঁপড়ে পুরাণ

প্রেমেন্দ্র মিত্র



পিঁপড়ে পুরাণ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ ১৩৯০
জানুয়ারী ১৯৮৪
দ্বিতীয় সংস্করণ :
ডিসেম্বর ১৯৮৮
পৌষ ১৩৯৫

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
মণীন্দ্রনাথ মান্না
পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ১০'০০ টাকা

চিরকালের ছোটদের হাতে—

এ বইতে যা আছে


পিঁপড়ে পুরাণ

সে অনেককাল আগের কথা।

তখন সবই ছিল আশ্চর্য রকমের। তখন ঠিক ভোরের বেলা সূর্য উঠতো; আর এমন মজা যে, ঠিক রাত হওয়ার আগেই সূর্য অস্ত যেত। দিনের বেলা তখন আলো থাকতো, আর রাত্তিরে হতো অন্ধকার।

পৃথিবীই ছিল তখন কি সুন্দর! মাটিতে নরম সবুজ ঘাস! হরেকরকম গাছে হরেকরকম রঙের ফুল, আর রাত্তিরবেলা আকাশে হাজার হাজার তারা—সে দেখতেই ছিল চমৎকার!

পাখিই ছিল তখন কতরকম। একরকম পাখি ছিল, তার নাম কাক। মিশকালো অন্ধকারের মত তার রঙ্। আর তার গলার স্বর! কেউ-কেউ বলে তার গলার স্বর নাকি ভালো ছিল না। আমরা কিন্তু তা বিশ্বাস করি না। যে-কোকিল আজকাল আখছার আমাদের পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, তারই যদি স্বর এত ভালো হয়, তবে না জানি কাকের স্বর কি মিষ্টি ছিল! আর এই কোকিল নাকি সেই কাকেদের বাসাতেই গলা-সাধতে শিখতো। সে-কাক এখন আর পাওয়া যায় না, কেউ কেউ বলে—উত্তর-মেরুতে পৃথিবীর যে সবচেয়ে বড় চিড়িয়াখানা আছে, সেখানে নাকি একটি কাক এখনো আছে। তার জোড়াটি মরে যাওয়ায় সেটিও নাকি ভারি মনের কষ্টে আছে—বেশিদিন আর বাঁচবে না। আর একরকম পাখি ছিল, তার নাম চড়ুই। সে-পাখি লোকের ঘরে-দোরে, কড়িকাঠের ফাটলে বাসা

বাঁধতো। ক্ষুদে-ক্ষুদে পাখিগুলি নাকি মানুষের বাসের কাছে নইলে থাকতো না। মানুষের ফেলা-ছড়ানো ক্ষুদ-কুঁড়ো খেয়েই তারা থাকতো।

তোমরা ঘোড়া বোধহয় কেউ কেউ দেখেছ। সে-ঘোড়া তখন পথে-ঘাটে গাড়ি টেনে লোক বয়ে বেড়াতো। কুকুর তো তখন যেখানে-সেখানে এখনকার চিতাবাঘের মতো সস্তা ছিল। এখন যেমন লোকে চিতাবাঘ পোষে, তখন তেমনি কুকুর পুষতো। আর একরকম জানোয়ার ছিল—তার নাম বেড়াল। সে-বেড়ালের কথা আমরা বেশি-কিছু জানি না। সেকালের লোকেরা বেড়াল-সম্বন্ধে বেশি-কিছু লিখে যায়নি।

একটি বহু পুরোনো সেকালের পুঁথিতে বেড়ালকে বাঘের মাসী বলা হয়েছে। তাতে মনে হয়, বেড়াল খুব প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল। কিন্তু এতবড় জানোয়ার লোকে বাড়িতে কি ক'রে পুষতো, তা আমরা এখনো বুঝতে পারিনি। সরকারী পশুশালার একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেড়াল-সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে একটি বই লিখেছেন। সেই বই প্রকাশিত হলে বেড়াল-সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানা যাবে। আরো এমন সব অদ্ভুত জানোয়ার সেকালে ছিল, যা চোখে দেখলেও তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না—ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি কত নাম করবো।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, তখনকার পিঁপড়ে নাকি খুব বড় হলেও মানুষের কড়ে আঙুলের চেয়ে বড় হতো না। সে-পিঁপড়েও ছিল নানাজাতের। মানুষের ঘরে-দোরে, মাঠে-গাছে নানারকমের গর্তের ভেতর বাসা বেঁধে থাকতো। তাদের মধ্যে দু'-এক জাতের পিঁপড়ে মানুষকে কামড়ে একটু যন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া আর

কোনো ক্ষতিই করতে পারতো না। দল বেঁধে একসঙ্গে তারা তখন থেকেই থাকতো বটে, কিন্তু মানুষ তখন মোটেই ভাবতে পারেনি যে, এই পিঁপড়ের সঙ্গে পৃথিবীর অধিকার নিয়ে তাকে একদিন লড়াই করতে হবে। অনেকে তখন পিঁপড়ের ওপর দয়া ক'রে তাদের বস্তা-বস্তা চিনি খেতে দিত।

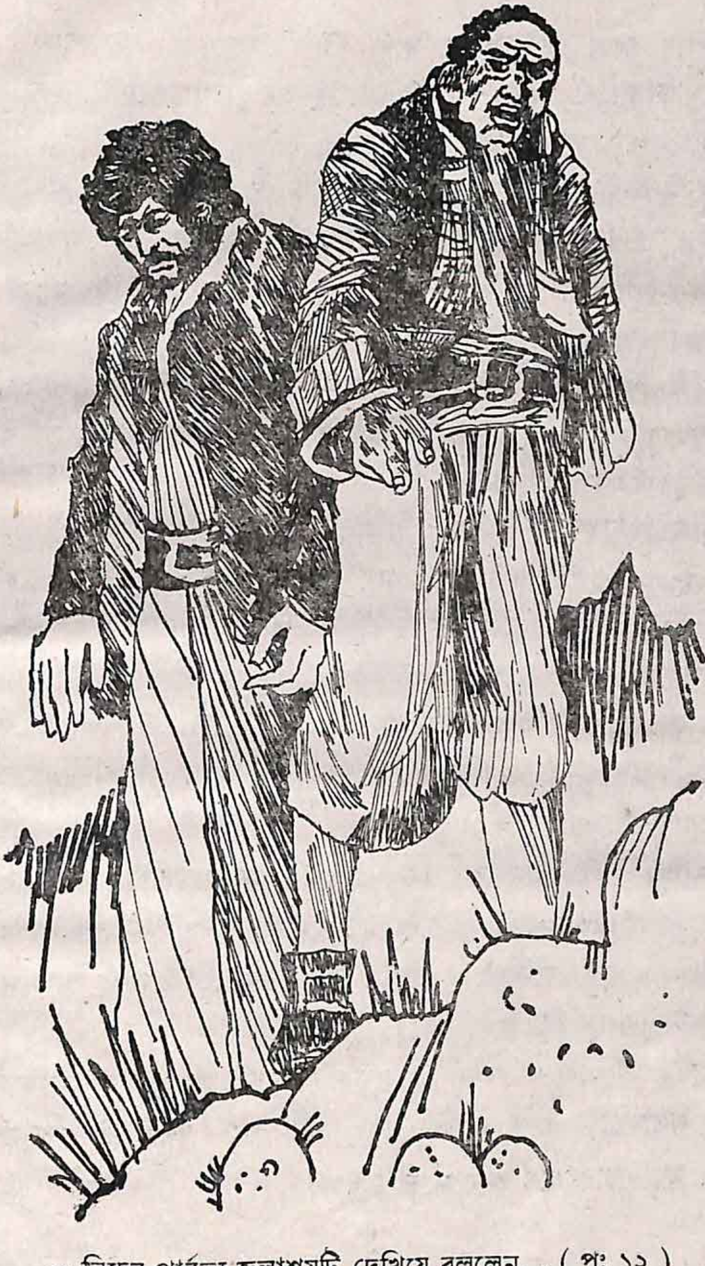
আর-বছরে দক্ষিণ-আমেরিকায় পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা ভয়ানকভাবে হেরে গেছি, একথা তোমরা সকলেই নিশ্চয়ই শুনেছ। কিন্তু তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, তখন সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকায় নানাজাতের মানুষের বাস ছিল। মানুষ তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেই ব্যস্ত, পিঁপড়েরা কি করছে না করছে, তা দেখবার কথা তাদের কল্পনায়ও আসেনি। খুব বেশি পিঁপড়ের উৎপাত হলে পিঁপড়ের গর্তে খানিকটা বিষাক্ত অ্যাসিড ঢেলে দিলেই ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। ৭৮৯৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ-আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল, জানা গেছে। তারপর থেকেই আন্দিজ-পাহাড়ের জঙ্গল থেকে এই নতুন-জাতের ছ'ফুট লম্বা পিঁপড়ে বেরিয়ে দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে মানুষ তাড়াতে শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর আগে অনেক পর্যটক সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকার পাহাড়-জঙ্গল ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কেউ-ই এই পিঁপড়ের কোনো সন্ধান পায়নি। ৬৭৫৭ সালে বিখ্যাত পর্যটক অশেষ রায় যখন দক্ষিণ-আমেরিকার জঙ্গল ঘুরে এসে আন্দিজ-পার্বত্যপ্রদেশে একরকম অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেন, তখন কাগজে-কাগজে তাঁকে এমন উপহাস-বিদ্রূপ করে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে চুপ ক'রে যেতে হয়। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর শেষ ডায়েরিতে লিখে যান: "আমি শপথ ক'রে বলে

যাচ্ছি—আমি যে অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেছি, তা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়।”

ওই আন্দিজ-পাহাড়ের কাছেই ৬৭৬৩ সালে একদল জাপানী রুপোর খনি আবিষ্কার ক’রে তাতে কাজ করতে গিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর পাঁচ বৎসর ধ’রে তাদের তন্ন-তন্ন ক’রে খুঁজেও কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তোমরা বোধহয় জান যে, সে-সময় এই ব্যাপার নিয়ে ভয়ানক হুলস্থূল পড়ে গেছল। অশেষ রায় যখন এই একহাজার জাপানীর অন্তর্ধানের সঙ্গে এই অদ্ভুত জানোয়ারের কোনো সংস্রব আছে বলেন, তখন লোকে তাঁকে শুধু পাগলা-গারদে পাঠাতে বাকি রেখেছিল। অশেষ রায় এই অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে যেসব কথা জানান, তা অত্যন্ত বিস্ময়জনক। সেকালের লোকেরা এই অপরূপ কাহিনীকে আজগুবি বলেছিল বলে তাদের বেশি দোষও আমরা দিতে পারি না।

অশেষ রায় তাঁর পর্যটন থেকে ফিরে কোনো কাগজে লিখেছিলেন ঃ “সেবার দক্ষিণ-আমেরিকা-ভ্রমণে আমার সঙ্গী ছিলেন আমার কাফ্রী বন্ধু, পৃথিবী-বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ্ মণ্ডুলা। আগের দিন আমরা মাসোর নদীর উৎসে পেঁাছোই। তারপর আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল আলাগাস হ্রদ।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা ক্লান্ত হয়ে সারাটা’র কাছে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে বিশ্রাম করছিলাম। আমাদের চারিপাশে আন্দিজের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা তাদের বিপুল দেহ নিয়ে ঘিরে ছিল। তখনো সূর্য অস্ত যায়নি। আমাদের পশ্চিমে—ঠিক আমাদের পাহাড়ের নিচের উপত্যকার উপর তখন অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়েছে। উপত্যকাটি আয়তনে খুব ছোট। চারিধারে পাহাড় যেন বিশাল



···নিচের পার্বত্য জলাশয়টি দেখিয়ে বললেন, (পৃঃ ১২)

দেওয়ালের মতো ওইটুকু জমিকে ঘিরে আছে। উপত্যকাটি আগাগোড়া তুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন। শুধু একজায়গায় ছোট একটি পার্বত্য জলাশয় দেখা যাচ্ছিল।

আমি তখন আমাদের ছোট্ট তাঁবুটি রাত্রের জন্যে খাটাবার বন্দোবস্ত করছি। মণ্ডুলা তাঁর সেদিনকার সংগৃহীত নতুন-জাতের কীটগুলি বাক্সবন্দী করছিলেন। হঠাৎ চাপা উত্তেজিতকণ্ঠে মণ্ডুলা ডাকলেন—'শুনুন।'

খুঁটি পুঁততে পুঁততে চেয়ে দেখি, তিনি নিবিষ্টভাবে নিচের পত্যকার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—'ব্যাপার কি?'

মণ্ডুলা শুধু ইসারায় তাঁর কাছে যেতে বললেন এবং তাঁর কাছে গেলে তিনি অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে নিচের পার্বত্য জলাশয়টি দেখিয়ে বললেন—'দেখতে পাচ্ছেন?'

জলাশয়ের ধারে কালোরঙের কি একটা জানোয়ারকে অস্পষ্টভাবে ঘুরতে-ফিরতে দেখা যাচ্ছিল। বললাম—'ও আর কি? কোনো জানোয়ার-টানোয়ার হবে বোধহয়।'

মণ্ডুলা ঈষৎ হেসে বললেন—'কোনো জানোয়ার-টানোয়ার যে হবে, তা আমিও বুঝেছি, কিন্তু কোন্ জানোয়ার? দক্ষিণ-আমেরিকায় অত বড় কালো জানোয়ারের একটা নাম করুন তো দেখি! আপনি দূরবীণটা একবার বের করুন তো!'

সূর্য এরই মধ্যে পশ্চিমের পাহাড়ের আড়াল হয়ে গেছে। নিচে সমস্ত জলাশয়টির ধারে একটির পর একটি ক'রে দশটি ঐ ধরনের কালো জানোয়ার এসে তখন জড়ো হয়েছে।

আমার হাত থেকে দূরবীণটা একরকম কেড়ে নিয়েই মণ্ডুলা চোখে লাগালেন। কিন্তু পরের মুহূর্তেই দূরবীণটা নামিয়ে বললেন—'যাঃ, সব মাটি হয়ে গেল।'

দুর্ভাগ্যক্রমে সেইদিনই পাহাড়ে ওঠবার সময়ে কেমন ক'রে না জানি ঠোকা লেগে দূরবীণের কাঁচ দু'টি ভেঙে গেছে। সূর্যের আলো তখন বিরল হয়ে এসেছে। তবু সেই আলোতেই আমাদের খালি চোখে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, গভীর অরণ্যের ভেতর থেকে প্রায় দু'শো ঐ অপরূপ জানোয়ার জলাশয়ের ধারে এসে জড়ো হয়েছে। তাদের আকৃতি অদ্ভুত—সামনে ও পেছনে দু'টি বড় বড় কালো ভাঁটাকে কে যেন এক-একটি খাটো কাঠিতে গেঁথে লম্বা-লম্বা পায়ের ওপর সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের আকৃতি যত না অদ্ভুত, তাদের আচরণ তার চেয়েও বেশী। দলবদ্ধ হয়ে অনেক জানোয়ার থাকে বটে, কিন্তু এমন অপরূপ শৃঙ্খলা কোনো জানোয়ারের ভেতর আছে বলে শুনিনি। তাদের একসারে চলা-ফেরা-দাঁড়ানোর সঙ্গে একমাত্র খুব শিক্ষিত সৈন্যের কুচকাওয়াজের তুলনা করা যায়।

যত তাদের গতিবিধি দেখছিলাম, দূরবীণের কাচ ভেঙে যাওয়ায় দুঃখ আমাদের ততই বাড়ছিল। সন্ধ্যের অন্ধকারে তারা শেষে একেবারে অরণ্যের সঙ্গে মিলিয়ে গেলে আমরা বিমর্ষভাবে সেদিক থেকে চোখ ফেরালাম। সেদিন রাত্রে তাঁবুতে শুয়ে-শুয়ে ঘুম আমাদের আসতে চাইছিল না। মণ্ডুলা তাঁর বিছানায় অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ ক'রে বললেন—'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, বলুন তো? এমন আশ্চর্য জানোয়ার এতকাল কোনো পর্যটকের চোখে পড়েনি এটা কি বিশ্বাস করা যায়?'

আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে

পড়েছি, মনে নেই। হঠাৎ চমকে জেগে উঠে দেখি. মঞ্জুলা উত্তেজিত-ভাবে আমায় ঝাঁকি দিচ্ছেন। আমি চোখ খুলতেই তিনি বললেন—'শীগ্‌গির বাইরে এসে দেখুন।'

তখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি, অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মঞ্জুলা উত্তেজিতভাবে বললেন—'চেয়ে দেখুন—নিচে চেয়ে দেখুন।'

নিচে চেয়ে দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। অন্ধকারে সেই পার্বত্য জলাশয়ের ধারে নানা জায়গায় অসংখ্য আলো জ্বলছে। সে-আলোয় আমাদের পাহাড় থেকে বিশেষ-কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, শুধু অস্পষ্টভাবে ওই জানোয়ারদের নড়া-চড়া এক-আধটু টের পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেইদিকে চেয়ে বসে রইলাম। এতবড় বিস্ময়জনক ব্যাপার বিশ্বাস করতে যেন আমাদের সাহস হচ্ছিল না।

ভোর হওয়ার কিছু আগেই সমস্ত আলো নিভে গেল। আমরা কিন্তু সেখান থেকে উঠতে পারিনি। ভোরের আলোয় ঐ জলাশয়ের দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। জলাশয়ের পশ্চিম-পাড়ে প্রায় দশবিঘা জমির জঙ্গল একেবারে সাফ হয়ে গেছে। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা যে প্রকাণ্ড গাছগুলি সে-স্থান অন্ধকার ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের চিহ্ন পর্যন্তও নেই।

মঞ্জুলার উত্তেজনা তখনো শান্ত হয়নি। আমার হাতটা সজোরে নাড়া দিয়ে তিনি বললেন—'আমার কি মনে হয় জানেন, আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখেছি তারা কীটজাতীয় প্রাণী!'

এবার কিন্তু আমি না হেসে পারলাম না, বললাম—'কারণ আপনি

কীট-তত্ত্ববিদ্ !'

মঞ্জুলা আমার পরিহাসে কান না দিয়ে বললেন—'হ্যাঁ, তাই! কীটজাতীয় ছাড়া পৃথিবীর কোনো প্রাণীর চারটার বেশি পা দেখেছেন?'

কথাটা সত্যি! আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখেছি, তাদের পা কতগুলি, তা গুনতে না পারলেও চারের যে বেশি, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

মঞ্জুলা বলে যাচ্ছিলেন—'তা ছাড়া আকৃতির কথা মনে রাখবেন।'

বললাম—'কিন্তু এত বড় কীট?'

মঞ্জুলা বললেন—'অসম্ভব তো নয়।'

তারপর পুরো একটি সপ্তাহ আমরা সেই পাহাড়ে ওই অদ্ভুত প্রাণী দেখবার জন্যে অপেক্ষা করি, কিন্তু আর কিছু দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।"

অশেষ রায়ের বর্ণনা এইখানেই শেষ হয়েছে। তারপর একহাজার বৎসর এই প্রাণীর কথা আর কিছু শোনা যায়নি। অশেষ রায় ও মঞ্জুলার কথায় পৃথিবীর লোক হাসলেও কেউ-কেউ যে এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে সেখানে যায়নি, এমন নয়। কিন্তু আর কোনো পর্যটকের চোখে কিছু পড়েনি। এখন আমরা অবশ্য বুঝতে পারছি যে, অশেষ রায় এই পিঁপড়েদেরই দেখেছিলেন! তাঁর বর্ণনার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়! কিন্তু মানুষ বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই ছিল!

এই পিঁপড়ের কথা যখন আমরা জানলাম, তখন আর সময় নেই। ৭৭৫৭ সালে একেবারে বজ্রঘাতের মতো আচম্বিতে মানুষকে এই পিঁপড়ের আক্রমণ অভিভূত ক'রে দেয়; আক্রমণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ এ-কথা কল্পনাও করেনি। পিঁপড়েরা যে বহুদিন থেকে

গোপনে প্রস্তুত হয়েছিল, তার প্রমাণ ৭০ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিম-ধারে দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত প্রধান নগর একদিনে ধ্বসে পড়ে। কতদিন আগে থেকে যে পিঁপড়েরা এই নগরগুলো ফোঁপরা ক'রে এসেছে, কেউ তা বলতে পারে না। মানুষ মাটির ওপরেই যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। মাটির তলায় কোনো শত্রু তার সর্বনাশের আয়োজন করছে, এ-কথা সে কেমন ক'রে জানবে! ৭৭৫৭ সালের ১লা ফাল্গুন রাত একটার সময় কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, পেরু, ইকোয়েডরের সমস্ত বড়-বড় শহর যখন হঠাৎ ভীষণ শব্দে ধ্বসে পড়ে, তখনো কেউ সন্দেহ করেনি যে, এ কোনো শত্রুর কাজ। বিরাট ভূমিকম্প ভেবেই মানুষ তখন ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ধ্বসে-পড়া নগরগুলির বিরাট বিশৃঙ্খলার ওপর যখন প্রভাত হলো, তখন যে-দৃশ্য প্রতি নগরের মুষ্টিমের জীবিত নগরবাসীদের চোখে পড়ল তা অতি ভয়ঙ্কর। প্রতি নগরের চারিধারে অসংখ্য পিপীলিকা-বাহিনী ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

পিঁপড়েদের সেই প্রথম আক্রমণে যে-সমস্ত নগর ধ্বংস হয়ে যায়, তার একটিমাত্র অধিবাসীই রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি রায়োবোমা নগরের ডন পেরিটো। নগর-ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গেই অধিকাংশ লোক মারা পড়েছিল, যে-কয়েকজন সকালবেলা পর্যন্ত কোনোরকমে জীবিত ছিল, পিঁপড়েরা তাদের নির্মমভাবে সংহার করে। মানুষ সেবার যুদ্ধের অবসর পর্যন্ত পায়নি—প্রস্তুতই তারা ছিল না! ডন পেরিটো কোনোরকমে তাঁর এরোপ্লেনে চ'ড়ে একেবারে মেক্সিকোতে পালিয়ে আসেন। এরোপ্লেনে চ'ড়েও যে তাঁর নিস্তার ছিল, তা নয়। এমনি এরোপ্লেনে ক'রে আরো অনেকে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাখাওয়ালা পিঁপড়েরা আকাশে পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ ক'রে তাঁদের সে-চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেয়। ডন পেরিটোর জীবনরক্ষা হয়েছিল

শুধু তাঁর উপস্থিত-বুদ্ধিতে! অন্য-সকলের মতো প্রথম থেকেই এরোপ্লেনে লম্বা পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা না ক'রে তিনি প্রথমে শুধু উর্ধ্বে আরোহণ করবার চেষ্টা করেন। পিঁপড়েরা আটহাজার ফিট পর্যন্ত তাঁকে তাড়া করে, কিন্তু তার বেশি তারা আর উঠতে পারে না বলেই তিনি রেহাই পান। পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের কাহিনী পৃথিবীর লোক তাঁর কাছেই পায়।

তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে পিঁপড়েরা কিভাবে গায়না, ব্রেজিল, বলিভিয়া ও আর্জেনটাইন-রিপাবলিক দখল করে, তার ইতিহাস তোমরা কিছু-কিছু নিশ্চয়ই জান।

আশ্চর্যের কথা এই যে, পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের পরেও দক্ষিণ-আমেরিকার অন্যান্য দেশ তেমনভাবে সাবধান হয়নি। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, প্রথম আক্রমণের পর দু'বৎসর পর্যন্ত তাদের আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায়নি। হঠাৎ দু'বৎসর বাদে একদিন মাঝরাতে ৫২ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিমের সমস্ত শহর ধ্বসে পড়ে। এই লঙ্গিচিউড ধ'রে পিঁপড়েদের আক্রমণ আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার! এবারেও সেই আগেরবারের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়। শুধু অরিনকো নদীর ধারে বলিভার নগরের লোকেরা আগে থেকে সন্দেহ ক'রে শহর ছেড়ে নদীতে অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে জড়ো হয়েছিল। তারাই কেবল যুদ্ধ ক'রে মরবার সৌভাগ্য পেয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রথম পিঁপড়েদের অদ্ভুত অস্ত্রের ও তাদের যুদ্ধ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের শেষে কয়েকজন মাত্র বলিভার-নগরবাসী নদী দিয়ে মোটর-লঞ্চে অ্যাটলান্টিক সাগরে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন।

পিঁপড়েরা যে-অস্ত্র ব্যবহার করে, তাকে খুব ভয়ঙ্কর একরকম

বোমা বলা যেতে পারে। কিন্তু বোমা-প্রয়োগ করার রীতিটাই সবচেয়ে অদ্ভুত। বলিভার-নগরবাসীরা বলেন—"যখন তীর থেকে বহু উড়ন্ত পিঁপড়েকে গোল-গোল একরকম জিনিস নিয়ে আমাদের দিকে উড়ে আসতে দেখি, তখনই তাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করি। অনেক পিঁপড়ে এইভাবে মারা পড়ে, কিন্তু দু'-একটা পিঁপড়ে সমস্ত গোলা-গুলি এড়িয়েও আমাদের জাহাজ-নৌকোতে এসে পড়ে। তাদের পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক বোমা ফেটে জাহাজ-নৌকো সব গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক বোমার সঙ্গে একটি ক'রে পিঁপড়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রাণ দেয়। দূর হতে নিক্ষেপ ক'রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা তারা রাখে না।"

পিঁপড়েদের দ্বিতীয় আক্রমণের পর সমস্ত পৃথিবী সচেতন হয়ে ওঠে। চীনের পিকিন শহরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা মিলে কর্তব্য স্থির করবার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে অসংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ, এরোপ্লেন ও সৈন্য দক্ষিণ-আমেরিকার বাকি দেশগুলির অধিবাসীদের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্যে পাঠানো হয়। কিন্তু যুদ্ধ করবে কার সঙ্গে? পিঁপড়েদের আস্তানার কোনো পাত্তাই কেউ পায় না। মাটির তলায় কোথা দিয়ে তাদের গতিবিধি, সমস্ত আমেরিকা খুঁড়ে না ফেললে জানবার উপায় নেই। সৈন্যেরা দিনের পর দিন, ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে তন্ন তন্ন ক'রে সমস্ত খুঁজে বেড়ায়। তারপর একদিন হঠাৎ এক জায়গায় গভীর-রাত্রে তাদের পায়ের তলার মাটি ধ্বসে পড়ে। সকালবেলা তাদের আর কোনো চিহ্নই পাওয়া যায়নি। এরোপ্লেনের দল ঝাঁকে-ঝাঁকে দক্ষিণ-আমেরিকার আকাশে বিচরণ ক'রে বেড়ায়। পিঁপড়েদের কোনো

পাত্তাই পাওয়া যায়নি। এরোপ্লেনগুলিরও কোনোমতে আট-হাজার ফিটের নিচে নামবার উপায় নেই, কোথা থেকে একশো এরোপ্লেনের জায়গায় হাজার-হাজার উড়ন্ত পিঁপড়ে এসে আক্রমণ করে।

পিঁপড়েদের সঙ্গে এরোপ্লেন নিয়ে লড়াই করা শক্ত। একটাকে মারতে একশোটা এসে ছেঁকে ধরে। সবচেয়ে মুস্কিল, তারা এরোপ্লেনের ঘূর্ণ্যমান পাখার সঙ্গে জড়িয়ে তাকে অচল ক'রে মাটিতে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে নিজেরাও মরে।

আটহাজার ফিট ওপর থেকে পিঁপড়েদের কোনো সন্ধানও মেলে না।

এদিকে মাটির ওপর বাকি সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকা তখন প্রাণপণে যুদ্ধর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। যেখানে যে শহর ছিল, সমস্ত শহরের লোক শহরের বাইরে নতুন ক'রে ঘর বেঁধে বাস করতে আরম্ভ করলে। কখন যে কোন্ শহর ধ্বসে পড়ে, তার ঠিক কি? পিঁপড়েরা কবে থেকে কোন্ শহরের তলা ফোঁপ্‌রা ক'রে রেখেছে, তা কে বলতে পারে?

কিন্তু পিঁপড়েদের তৃতীয় ও শেষ আক্রমণ এলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে! হঠাৎ একদিন সমস্ত নতুন শহরের ভেতর সকাল থেকে মড়ক শুরু হয়ে গেল। সুস্থ-সবল মানুষ হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায়, তারপর কয়েক মিনিট হাত-পা খিঁচে মারা যায়! কাতারে-কাতারে সকাল থেকে লোক মারা পড়তে থাকে, অথচ ডাক্তার-বৈজ্ঞানিকেরা রোগের স্বরূপই খুঁজে পান না। সারা পৃথিবী এ-সংবাদ শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। বড়-বড় মাথা ঘেমে উঠল, কিন্তু এই মড়কের কারণ বোঝা গেল না। একদিনে এইভাবে অর্ধেক আমেরিকার লোক

নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর পরের দিন সকালে রোগের কারণ আবিষ্কার করলে কিন্তু বাহিয়া-শহরের একজন মুটে। সকালবেলা শহরের সৈন্যাধ্যক্ষ, শাসনকর্তা আর তিনজন বৈজ্ঞানিকের একটি গোপন-সভা বসেছে। শাসনকর্তা নিরুপায় হয়ে শহর ছেড়ে, আমেরিকা ছেড়ে, একেবারে জাহাজে ক'রে এই ভয়ানক দেশ ছেড়ে যাওয়ারই প্রস্তাব করেছেন। বৈজ্ঞানিক ও সেনাপতিদের মধ্যে এই কথা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে—এমনভাবে পিঁপড়েদের কাছে হার স্বীকার ক'রে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মরাও ভালো বলে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন, এমন সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদের সভার প্রহরীকে একরকম বগল-দাবাতে চেপে ধরে নিয়েই একটা বিশালকায় লোক ঘরের ভেতর এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। সভার সকলে তো স্তম্ভিত! লোকটা যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া—মাংসের একটা পাহাড় বললেই হয়। কিন্তু তার সমস্ত মুখে কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে। সে-মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায় যে, এই অজানা ভয়ঙ্কর রোগ তাকে প্রবলভাবেই আক্রমণ করেছে। শেষ হওয়ার তার আর দেরি নেই। সেই বিশাল বিরাট দেহ সেই ভীষণ রোগের প্রভাবে এরমধ্যেই কাঁপতে শুরু করেছে। তার ভীষণ বাহুর চাপে প্রহরীটিরও তখন প্রাণান্ত হয়ে এসেছে। প্রথম বিস্ময় কেটে গেলে সেনাপতি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার বাহুপাশ থেকে প্রহরীকে ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টিত হলেন। প্রহরী তখন চিৎকার করছে যন্ত্রণায়! কিন্তু সে বিশাল দেহের জোরের সঙ্গে কি পারা যায়! লোকটার তখন হাত-পা-খিঁচুনি শুরু হয়েছে। অনেক কষ্টে প্রহরীকে যখন সবাই মিলে মুক্ত করলেন, তখন দেখা গেল যে, তার একটা পাঁজরা একেবারে ভেঙে গেছে। প্রহরী তো অনেক কষ্টে জানালে

যে, এই লোকটাকে সভায় ঢুকতে মানা করতে গিয়েই তার এই দুর্দশা এবং লোকটাকে সে চেনে। সে এই শহরের একজন মুটে—তার নাম গুস্তাভ।

কেন তার সভায় ঢোকবার এত ব্যগ্রতা, সে-কথা তখন গুস্তাভকে জিজ্ঞেস করা বৃথা। মৃত্যুর পূর্বলক্ষণরূপ প্রবল হাত-পা-খিঁচুনি তখন তার শুরু হয়ে গেছে। কয়েক মিনিট বাদেই সব শেষ হয়ে যাবে। সভার সকলে বিমর্ষমুখে তারই অপেক্ষা করতে লাগলেন। দু'-এক মিনিটের মধ্যেই গুস্তাভ মারা গেল, কিন্তু মারা যাওয়ার আগে একটিবার চোখ খুলে সে উন্মত্তের মতো চিৎকার ক'রে উঠেছিল—'জল খেয়ো না।' তারপর সব শেষ।

'জল খেয়ো না!' এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সামনেও সেনাপতির কৌতুক-বোধ হলো। শাসনকর্তা কাতরভাবে মুখ ফেরালেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যে হঠাৎ একজন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। মুখচোখ তাঁর অসাধারণভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেনাপতির পিঠ হঠাৎ চাপড়ে দিয়ে তিনি বললেন—'আমরা কি গাধা!'

সবাই তো অবাক। শাসনকর্তা বললেন—'আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে যান, কাল থেকে আজ পর্যন্ত একটিবারও তো চোখের পাতা মোড়েননি।'

সবাই ভাবছিল—বৈজ্ঞানিকও বোধহয় পাগল হয়ে গেলেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পাগল হননি। সেনাপতিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে তিনি বললেন—'আপনি কাল থেকে এখন পর্যন্ত কি খেয়েছেন?'

ম্লান হেসে শাসনকর্তা বললেন—'খাওয়ার কি সময় পেয়েছি—শুধু এক পেয়ালা দুধ।'

কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁরও চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন—'এবার বুঝেছেন ?'

এতক্ষণে সকলেই বুঝেছিলেন। নানান কারণে, বিশেষত এই ভয়ঙ্কর মড়ক-নিবারণের উপায়-চিন্তায় তাঁদের কারুরই এই একদিন জল তো দূরের কথা, অন্য কিছু খাওয়ারই সুযোগ হয়নি।

বৈজ্ঞানিক বললেন—'যাকে আমরা নতুন রোগ বলে ভেবেছিলাম, তা কেবল বিষের ক্রিয়ামাত্র। শহরের জল বিষাক্ত হয়ে গেছে এবং কারা যে বিষাক্ত করেছে, তা বোধহয় আর বলতে হবে না!'

শহরের সব জায়গায় অবশ্য তখনই ঢেঁড়া পিটে দেওয়া হলো এবং দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত শহরে তার ক'রে একথা জানিয়ে দেওয়া হলো।

সত্যই শহরের জল বিষাক্ত হয়েছিল। প্রত্যেক শহরের প্রধান ট্যাঙ্কের জল কিভাবে কখন যে পিঁপড়েরা বিষাক্ত ক'রে দিয়েছিল, তা অবশ্য কেউ জানে না!

কোনোরকমে এ-যাত্রা মানুষ রক্ষা পেলো বটে, কিন্তু দক্ষিণ-আমেরিকার অর্ধেক মানুষ কাবার হওয়ার আগে নয়।

এ-ধাক্কা আবার সামলাতে না সামলাতে হঠাৎ একদিন গভীর-রাত্রে শহরে-শহরে সাড়া পড়ে গেল—'পিঁপড়েরা আক্রমণ করতে আসছে! এবার যুদ্ধ মাটির ওপরে—সামনা-সামনি।' মানুষ এরই জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিল। মাটির ওপর যুদ্ধ করতেই সে অভ্যস্ত। এ-যুদ্ধের জন্যে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

পিঁপড়েদের এই তৃতীয় আক্রমণের কাহিনী 'রায়ো-ডি-জানেইরো'র বিখ্যাত লেখক 'সেনর সাবাটিনি'র লেখা থেকে আমরা পেয়েছি। তাঁর বিবরণই এখানে তুলে দিলাম।

সেনর সাবাটিনি লিখেছেন: "হঠাৎ গভীর-রাত্রে শহরের পশ্চিম-

ধারের প্রাচীরের প্রহরীরা সংবাদ দিলে যে, দূরে লাখ-লাখ পিঁপড়ে এসে জড়ো হয়েছে। প্রস্তুত আমরা দিনরাতই থাকতাম। সুতরাং এ-সংবাদে আমাদের বিচলিত হওয়ার কিছু ছিল না। বরং এতদিন বাদে সামনা-সামনি যুঝতে পাবো বলে আমরাও উল্লসিত হয়ে উঠলাম। পশ্চিমের প্রাচীরের সমস্ত সার্চলাইট তখন রাত্রিকে দিন ক'রে তুলেছে। সেনাপতির আদেশে অন্য সমস্ত দিকে কয়েকজন প্রহরী ও সৈন্য ছাড়া আমরা সকলে পশ্চিমে নগর-প্রাকারের বাইরে এসে জড়ো হলাম।

সেখানে যে-দৃশ্য আমরা দেখলাম, তা জীবনে ভোলবার নয়। অন্ধকার রাত্রি আমাদের অসংখ্য সার্চলাইটের প্রখর আলোয় তিন-মাইল পর্যন্ত একেবারে যেন পেছিয়ে গেছে। সেই আলোয় আমাদের শহর থেকে দু'মাইল দূরে অসংখ্য পিঁপড়ের বাহিনী কালো-সমুদ্রের বন্যার মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পিঁপড়ের সারের পর পিঁপড়ের সার—যতদূর আলো পৌঁছোয়, ততদূর পর্যন্ত শুধু পিঁপড়ের সমুদ্র !

সেনাপতির আদেশে আমাদের একহাজার কামান গর্জন ক'রে উঠলো। ঘন পিঁপড়ের সারের মধ্যে আমাদের কামানের গোলায় যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা আরম্ভ হলো, তা বর্ণনা করা যায় না। দিকে-দিকে আমাদের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়েও কিন্তু পিঁপড়েরা থামল না। মরা পিঁপড়ের স্তূপের ওপর দিয়ে নতুন পিঁপড়ের দল সমানভাবে অগ্রসর হতে লাগলো।

পিঁপড়েরা আমাদের গোলার জবাব দেয় না, শুধু নিঃশব্দে অগ্রসর হয়। সেনাপতির আদেশে এবার আমরা অগ্রসর হলাম। প্রথমে বিষাক্ত-গ্যাস নিয়ে একদল, তার পিছু-পিছু আমাদের আটশত ট্যাঙ্ক।

প্রাচীর থেকে সার্চলাইট নামিয়ে বড় বড় গাড়ির ওপর তুলে সেগুলিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

পিঁপড়েদের দিক থেকে তবুও কোনো জবাব নেই। শুধু তারা ধীরে-ধীরে এগোয়।

সেনাপতি আদেশ দিলেন—'বিষাক্ত-গ্যাস ছাড়ো।'

বিষাক্ত-গ্যাস ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কিন্তু পিঁপড়েদের অগ্রসর হওয়া বন্ধ হলো। সে-গ্যাসে এবং আমাদের ট্যাঙ্কগুলির মেসিনগানের গুলিতে লাখো-লাখো পিঁপড়ে মারা গেল। যেদিকে বিষাক্ত-গ্যাস ছোঁড়া হয়, সেদিকে পিঁপড়ের সার যেন কে মুছে দেয়। শুধু মাটি কালো ক'রে অসংখ্য পিঁপড়ের মৃতদেহ পড়ে থাকে। আমাদের ট্যাঙ্কগুলি সেই মরা-পিঁপড়ের সার মাড়িয়ে অগ্রসর হয়; আর তাদের মেশিন-গানের গুলিতে পিঁপড়ের দল ছারখার হয়ে যায়। পিঁপড়েদের এই দুরবস্থায় তখন আমরা উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। শহর থেকে ছেলে, মেয়ে, বুড়োরা পর্যন্ত তখন পিঁপড়েদের ধ্বংস-যজ্ঞ দেখবার জন্য প্রাচীরের বাইরে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পিঁপড়েরা হঠাৎ যখন পিছু হাঁটতে আরম্ভ করল, তখন তাদের অর্ধেকের বেশি মারা পড়েছে। কিন্তু পেছুলে কি হবে? আমাদের ট্যাঙ্কগুলি তখন একেবারে তাদের ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সেই বিরাট ট্যাঙ্কগুলির চাপেই যে কত পিঁপড়ে মারা গেল, তার ঠিক নেই।

আমার তখন মনে হচ্ছিল, এতদিন আমরা মিথ্যাই ভয় পেয়েছি। হয়তো কোনো উপায়ে তারা কিছু শক্তি অর্জন করেছে; কিন্তু হাজার হ'লেও তারা কীট—সামান্য কীট মাত্র। মানুষের শক্তি, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের কৌশলের বিরুদ্ধে তারা লড়তে আসে কোন্ সাহসে? তাদের

এই দুর্দশায় একটু যেন করুণাই আমার হচ্ছিল। সেনাপতির আদেশে তখন অশ্বারোহী সৈন্যের দল তাদের ভেতর গিয়ে পড়েছে। এ-যুদ্ধটা আমার একটা বীভৎস প্রহসনের মতো লাগছিল। অসহায় পিঁপড়ের দলের পিছু হাঁটার ব্যর্থ-চেষ্টা দেখে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, ছিন্নভিন্ন হয়ে পিছু হাঁটলেও তারা কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয়নি।

এবার সেনাপতির আদেশে পদাতিকদল অগ্রসর হলো। সেনাপতির আদেশ—একটি পিঁপড়েও যেন আজ না বাঁচে। কিন্তু খানিক দূর অগ্রসর হতে না হতেই আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিঁপড়ে-বাহিনীর একেবারে পেছনে প্রায় শ'-পাঁচেক সার্চলাইট জ্বলে উঠছে। পিঁপড়েদেরও যে সার্চলাইট থাকতে পারে এবং এতক্ষণ বাদে তা জ্বালবারই বা কি প্রয়োজন, ভেবে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। সার্চলাইট তাকে ঠিক বলা চলে না। আমাদের সার্চ লাইটের আলোর চেয়ে সে আলো শতগুণ তীব্র ও একটু যেন সব্‌জে রঙের। সে তীব্র আলোর সরু-জিহ্বা যেন তারা আমাদের আগের সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অভূতপূর্ব দৃশ্যে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সারের পর সার সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে সে-আলো বুলিয়ে-বুলিয়ে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল।

জুতোর ফিতেটা অনেকক্ষণ থেকে খুলে গিয়েছিল। এই অবসরে নিচু হয়ে বসে সেটা বেঁধে উঠে আমি দেখি যে, সে-আলো আমাদের সার ছাড়িয়ে আমাদের অনেক পেছনের সারের মুখের ওপর দিয়ে তারা দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার পাশের সৈনিকটি আমার হাতটা নাড়া দিয়ে বললে—

'সার্চলাইটগুলো নিভে গেল কেন বল তো ?'

আমি হেসে উঠলাম—'কানা হয়ে গেছ নাকি, সার্চলাইট আবার নিভল কোথায় ? দিব্যি তো জ্বলছে।'

সে আবার ভীতকণ্ঠে বললে—'কই, আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না !'

'আমি তার পিঠ চাপড়ে বললাম—'ওই চড়া আলোয় চোখটায় একটু ধাঁধা লেগেছে। চোখটা একটু রগড়ে নাও।'

কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমাদের সামনের সার থেকে একজন চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো—'আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না !'

আমার পাশের সৈনিক আমার হাতটা কাতরভাবে জড়িয়ে ধরে বললে—'তবু যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না ভাই, কি হবে ?'

বিদ্যুতের মতো চকিতে এ-ব্যাপারের আসল অর্থ আমার মনে খেলে গেল। আমাদের সমস্ত বন্দুক-কামান স্তব্ধ হয়ে গেছে, আমাদের ট্যাঙ্কগুলিও নিঃশব্দ হয়ে গেছে. শুধু চারিদিক থেকে অসহায় সৈন্যদের চিৎকার. কলরব, বিলাপ তখন তুমুল হয়ে উঠেছে।

আতঙ্কে পেছন ফিরে চিৎকার করে উঠলাম—'চোখ বন্ধ কর, আলোর দিকে চেয়ো না।' কিন্তু চারিদিকের ভীত-অসহায় সৈন্যদের কলরব ছাপিয়ে সে-ক্ষীণস্বর কতদূর আর পৌঁছোয় ! পিঁপড়েরা তখন আমাদের শহরের প্রাচীরের কাছে সমবেত ছেলেমেয়ে ও বুড়োদের মুখের ওপর দিয়ে আলো বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপর যে ভয়ঙ্কর বীভৎস ব্যাপার আরম্ভ হলো, তা বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই। সেই অন্ধ-অসহায় সৈন্যদের ওপর অসংখ্য পিঁপড়ে হিংস্র যমদূতের মতো ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়লো।

চিৎকার ক'রে বললাম—'পালাও, পালাও!'

কে পালাবে? কোথায় পালাবে?

অন্ধ সৈন্যের দল অসহায়ভাবে পালাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে মরতে লাগলো এবং পিঁপড়ের দল সেই বিশৃঙ্খল জটলাকে নির্মমভাবে সংহার করতে শুরু করলো। এই হতভাগ্য সৈন্যদের কোনোরকমে বাঁচাবার উপায় না দেখে অবশেষে নিজের প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে ছুটতে হলো। কিন্তু ছুটে পালানোও সোজা নয়, পিঁপড়েরা তখন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। একটা বিশাল কালো পিঁপড়ে আমার পিঠের জামাটা কামড়ে ধরেছিল। হাতা-হাতি লড়াই পিঁপড়েদের সঙ্গে এর আগে হয়নি। সেই বিকট কীটকে দেখে শিশুর মতো ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম। কিন্তু চিৎকার করবার সময় সে নয়—পাশ থেকে আর একটা পিঁপড়ে তখন আমার পায়ে প্রচণ্ড কামড় দিয়ে চলেছে। সেটার মাথায় ছোরা বসিয়ে দিতেই চট্‌চটে একরকম রসে সমস্ত হাতটা আমার ভিজে গেল এবং পরমুহূর্তেই পেছনের পিঁপড়েটার টানে একেবারে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। সমস্ত পিঠটা আমার ঐরকম রসে ভিজে ওঠাতে বুঝলাম, পেছনের পিঁপড়েটাকে দেহের চাপে থেঁৎলেই ফেলেছি। পিঁপড়েদের দেহগুলো আকারে বড় হলেও অত্যন্ত হালকা ও মানুষের তুলনায় অত্যন্ত নরম, এই যা রক্ষা। তাড়াতাড়ি উঠে আবার ছুট দিলাম—কোন্‌দিকে, তা মনে নেই।"

এইখানে সেনর সাবাটিনির বর্ণনা শেষ হয়েছে। রায়ো-ডি-জানেইরো'র সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে একমাত্র সেনর সাবাটিনিই রক্ষা পেয়েছিলেন। পিঁপড়েদের হাত কোনরকমে এড়িয়ে সমুদ্রে পড়ে ছোট একটি ভেলার সাহায্যে নিকটের একটি দ্বীপে উঠে তিনি সেবার

প্রাণ বাঁচান! কয়েকবছর বাদে একটি চীনে-জাহাজ তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।

রায়ো-ডি-জানেইরো'র সঙ্গে-সঙ্গে পিঁপড়েরা সেদিন দক্ষিণ-আমেরিকার বাকি সমস্ত শহরই আক্রমণ করে। সে-আক্রমণে কোনো শহরই রক্ষা পায়নি। দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে সেইদিনই মানুষের পাট ওঠে। তারপর আর মানুষ সেখানে পা দিতে পারেনি। গত বৎসর সে-চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা কি ভীষণভাবে হেরে গেছি, সে-খবর তো তোমরা সবাই জানো।

এই হলো গিয়ে পিঁপড়েদের দক্ষিণ-আমেরিকা অধিকারের ইতিহাস। মানুষ অবশ্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। সামান্য কীটের হাতে এই লাঞ্ছনার শোধ নেওয়ার জন্যে পৃথিবীর বড়-বড় বৈজ্ঞানিক এখন মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু শিগ্‌গির যে আমরা দক্ষিণ-আমেরিকা ফিরে পাবো, তারও বড় আশা নেই; কারণ যে অদ্ভুত আলোয় তারা অমন ক'রে মানুষকে অন্ধ ক'রে দেয়, তার রহস্য এখনো আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারেননি!

পিঁপড়েদের আমেরিকা-অধিকারের ইতিহাস পাঁচ বছর আগে সংক্ষিপ্তভাবে কাগজে বের হয়। তারপর সেই বিবরণ পড়ে অনেকে কৌতূহলী হয়ে আরো অনেক কথা জানতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার কোনো সুবিধা হয়নি। কারণ এতদিন পিঁপড়েদের সম্বন্ধে ওর বেশি কিছু জানা ছিল না। পিঁপড়েদের সম্বন্ধে বিশদভাবে সন্ধান করা তো দূরের কথা, মানুষ সেবার পিঁপড়েদের আক্রমণে দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে পালাবারই পথ পায়নি! পিঁপড়েরা কেমন ক'রে এই বিপুল শক্তি অর্জন করেছে, তাদের রাষ্ট্রসমাজের গঠন কেমন, তারা দক্ষিণ-

আমেরিকাকে কিভাবে এখন গড়ে তুলেছে, তার কোনো বিবরণই মানুষের জানবার কোনো সুযোগ হতো না—যদি না···

···যদি না ভারতীয় জাহাজ 'যমুনা'র সমস্ত নাবিক আর যাত্রী একটি দুরন্ত ডানপিটে ছেলের দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে উঠতো! একটি ছেলের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে দক্ষিণ-আমেরিকার পিঁপড়েদের বিবরণ-সংগ্রহের সম্বন্ধ কোথায়, তা প্রথমে বোঝা একটু কঠিন বটে। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার ক'রেই বলি। ভারতীয় নৌবহরের 'যমুনা' জাহাজটি সেবার ফিলিপাইনের পূর্ব-উপকূল হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোটো দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল। দ্বীপটি দক্ষিণ-আমেরিকার কাছাকাছি ও পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজনের প্রধান ঘাঁটী। মাঝ-রাস্তায় ঝড় হয়ে আগেরদিন জাহাজ নির্দিষ্ট পথ থেকে একটু দূরে এসে পড়েছিল, এখন আবার নির্দিষ্ট পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল; কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল শুধু একটি ছেলের দৌরাত্ম্যে। ছেলেটি 'যমুনা'র ক্যাপ্টেনের, বয়স তার মাত্র বারো, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি ও সাহসে সে পঁচিশ বছরের যুবককেও হার মানায়। ঝড়ের রাত্রে সবাই যখন জাহাজ ও নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত, এমন সময় দেখা গেল, ছেলেটি জাহাজের দু'টিমাত্র লাইফবোটের একটি খুলে ঝড়ের সমুদ্রে নামিয়ে দিয়ে বসে আছে। ঝড় থেমে যাওয়ার পর হঠাৎ ছেলেটির খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল যে, সবচেয়ে বড় মাস্তুলের আগায় উঠে সে বসে আছে। নামিয়ে এনে ধমক দেওয়ায় সে বললে—'আমি নতুন দেশ আবিষ্কার কবছিলাম।'

ঝড়ের পরের দিন রাত্রে হঠাৎ মাঝ-সমুদ্রে বারবার জাহাজ থেকে সার্চলাইট জ্বলতে দেখে দু'-একজন যাত্রী এসে ক্যাপ্টেনকে কারণ

জিজ্ঞেস করলে। ক্যাপ্টেন তো অবাক! মাঝ-সমুদ্রে—যেখানে অন্য কোনো জাহাজের নামগন্ধ নেই, সেখানে সার্চলাইট জ্বালাবার মানে কি? কোন্ নাবিক এরকম করছে, তার সন্ধান নিয়ে তাকে শাসন করবার জন্যে সার্চলাইট-টাওয়ারে গিয়ে ক্যাপ্টেন দেখেন যে, তাঁর ছেলেটি পরমানন্দে সার্চলাইট জ্বালিয়ে সমুদ্রের এধার থেকে ওধার বুলিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি কান ধ'রে তাকে শাসন করতে যাবেন এমন সময়ে চকিত সার্চলাইটের আলোকে একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়ায় তিনি ছেলেকে শাসন করার কথা ভুলে নিজেই সার্চলাইট ধরে বসলেন।

সে-আলোয় যা দেখা গেল, তাতে বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক। দেখা গেল যে, জাহাজ থেকে শ'দুয়েক গজ দূরে একটি ছোট্ট ভেলা সমুদ্রের ওপর দুলছে। তার ওপর আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একটি অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের দেহ। মানুষটি বেঁচে আছে কিনা, বোঝা যায় না।

তৎক্ষণাৎ তিনি নৌকো নামিয়ে ভেলাটি ধরে আনবার আদেশ দিলেন। আর তার ফলেই সেই ভেলাতে বাঁধা লোকটির অর্থাৎ দক্ষিণ-আমেরিকার পিঁপড়েদের ইতিহাস যে একটিমাত্র লোকের জানা ছিল, তাঁর উদ্ধার হলো।

তিনি সুখময় সরকার। দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে মানুষ পালিয়ে আসার পর পাঁচবছর তিনি সে-দেশে কাটিয়েছেন পিঁপড়েদের সঙ্গে। আর মানুষের ভেতর একা তিনিই তাদের সমস্ত ব্যাপার জেনে জীবিত-অবস্থায় মানুষের দেশে আবার ফিরতে পেরেছেন। পিঁপড়েদের সঙ্গে তাঁর বাসের কাহিনী তিনি নিজমুখে যা বলেছেন, তা-ই আমরা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম। রায়ো-ডি-জানেইরো'র পতনের দিন তিনি নগরের ভেতর একটি ল্যাবরেটরিতে গবেষণায়



…কালো পিঁপড়ের দল তাদের তাড়া করে আসছে (পৃঃ ৩২)

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় অযুত মানুষের আর্তনাদ তাঁর কানে এসে পৌঁছোয়। এখান থেকেই তাঁর বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে :

"প্রথমে মনে হলো, আমাদের সৈন্যেরা বুঝি যুদ্ধজয় করেছে, তাই এই জয়ধ্বনি ; কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম—না, এ-তো আনন্দধ্বনি নয়. এ যেন সহস্র-কণ্ঠের আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে। এ-শব্দ শুনলে গায়ের ভেতর যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে।

"তাড়াতাড়ি কী ব্যাপার দেখবার জন্যে নগর-প্রাচীরের কাছে গেলাম ; কিন্তু ওপরে আর উঠতে হলো না। দূরে তোরণের ভেতর দিয়ে দেখি—অন্ধের মতো হাতড়াতে-হাতড়াতে কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে আসছে। তাদের চলবার ভঙ্গি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ; কিন্তু বিস্ময়ের সময় বেশি ছিল না। তাদের পেছন-পেছনই দেখি—অগুনতি কালো-পিঁপড়ের দল তাদের তাড়া ক'রে আসছে। অসহায় সৈন্যদের পিঁপড়েদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার কোনো ক্ষমতাই নেই। তারা এলোপাথাড়িভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে, কিন্তু পিঁপড়েরা অনায়াসে তাদের আঘাত এড়িয়ে একেবারে তাদের মর্মস্থলে ঘা দিচ্ছে।

"নগর-তোরণ পার হয়ে যে-কয়জন এসেছিল, তাদের কেউই শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেলে না, একজনমাত্র সৈন্য প্রাণপণ বেগে ছুটে পিঁপড়েদের পেছনে ফেলে আমাদের কাছ-পর্যন্ত এসে পড়েছিল। পিঁপড়েরা তখন আমাদের ধরে-ধরে। পিঁপড়েদের হাতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই, বুঝতে পারছিলাম।

"সেইজন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় মনে হলো, বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু এভাবে হওয়া উচিত নয়। মরতে যদি হয়, তো নিজের পরীক্ষাগারের ভেতর নিজের গবেষণা করতে করতেই মরবো। তা ছাড়া যে

পরীক্ষাটি অসমাপ্ত রেখে এসেছি. পরীক্ষাগারের সকল দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে পিঁপড়েদের গতিরোধ করলে তা সমাপ্ত করবার সময়ও হয়তো পেতে পারি।

"তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটছিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হলো, এই সৈন্য-বেচারীকেও তো আমার সঙ্গে নিতে পারি। পেছন ফিরে বললাম —'আমার পিছু-পিছু এস! খানিকটা নিরাপদ হতে পারবে! কিন্তু সে আমার গলার আওয়াজ শুনে ভড়কে যেভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগলো, তাতে মনে হলো, আমি যেন অদৃশ্য কোনো একটা পদার্থ। বললাম—'হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? এস আমার সঙ্গে।'

'কিন্তু আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

"এ-কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না; কিন্তু তখন সে-কথা আলোচনা করবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ছুটতে-ছুটতে যখন পরীক্ষাগারে এসে পড়লাম, তখন দুটো পিঁপড়ে আমাদের পিছু-পিছু এসে প্রায় ধরে ফেলেছে। সৈন্যটিকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে নিজে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। তারি ভেতর কিন্তু একটা পিঁপড়ে ইতিমধ্যে আধখানা শরীর ভেতর ঢুকিয়ে ফেলেছিল। দরজার চাপে তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আমার ঘরের মধ্যে পড়লো।

"দরজাটা দিয়ে আমার মনে হলো, যাই হোক—এখন কিছুক্ষণের জন্যে নিরাপদ হওয়া যাবে। পরীক্ষাগারের সমস্ত জানলা আগে-থেকেই বন্ধ ছিল। পিঁপড়েরা ভেঙে না ঢোকা পর্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে কাজ করা যাবে।

"এইবার আমার সঙ্গে যে সৈন্যটি এসেছিল, তার দিকে ফিরে

বললাম—'মাটির ওপর যুদ্ধ, তাতেও পিঁপড়েদের সাথে পারা গেল না —কি তাদের এমন ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র !'

"লোকটা মেঝের ওপর মাথা নিচু ক'রে বসে ছিল। আমার দিকে চোখ তুলে চাইতেই ঘরের আলোয় তার চোখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম—চোখের তারার জায়গায় তার রগ্‌রগে একটা ক্ষত।

"তারপর তিনদিন পরীক্ষাগারের ভেতর বন্দী হয়ে আছি। সৈন্যটির কাছে যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর যে-দুর্দশার কাহিনী শুনলাম, তারপর আর কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হয়নি। শুধু শান্তভাবে মানুষের নতুন-জেতাদের হাতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। এখনো কেন যে পিঁপড়েরা আমাদের ধরবার চেষ্টা করেনি, তা বুঝতে পারছি না। আমাদের দরজায় তো সারাক্ষণই প্রহরীর মতো একটি পিঁপড়ে মোতায়েন আছে, দেখতে পাচ্ছি চাবির ফুটোর ভেতর দিয়ে। জানলাগুলো দিয়েও সারাক্ষণই একটা-না-একটা পিঁপড়ে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা এখনো অক্ষতদেহে বেঁচে আছি। যারা অজ্ঞাত-আলো দিয়ে মানুষকে অন্ধ করবার বিদ্যা আয়ত্ত করেছে, তারা একটা সামান্য দরজা ভেঙে ঢুকতে পারে না, এমন কথা অবশ্য মনেও স্থান দিইনি। তবুও এদের মতলব কী, বুঝে উঠতে পারছি না।

"চতুর্থদিন কিন্তু সব দুর্ভাবনার শেষ হলো। পরীক্ষাগারের ভেতর যা সামান্য খাবার-দাবার ছিল তা এ-ক'দিনে আমরা নিঃশেষ ক'রে ফেলেছি। সকাল থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে, পিঁপড়েরা না মারলেও উপবাসেই কয়েকদিনের ভেতর আমাদের মরতে হবে। পিঁপড়েদেরও সেই মতলব আছে কিনা, বলতে পারি না। এমন ক'রে নিশ্চেষ্টভাবে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করাও অসহ্য। ভাবলাম,



...এক এক করে প্রায় ছটি বৃহদাকার (৩৬ পৃঃ)

বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু তার যন্ত্র হাতে নিয়েই হোক। যে-সাধনা আজীবন ক'রে এসেছি, মরবার সময় যেন তারই মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে পারি। এই ভেবে যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজের গবেষণায় মন দিয়েছি, এমন সময় দেখি—বন্ধ দরজার কঠিন লোহার মতো কাঠ, কী অস্ত্রে জানি না, একেবারে মাখনের মতো কেটে যাচ্ছে। চারিধার কাটা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটা সশব্দে ভেতরে পড়ে গেল। অন্ধ সৈনিকটি সে-শব্দে চমকে ভীত হয়ে একধারে সংকুচিত হয়ে গিয়ে লুকোল। আমিও ভয়ঙ্কর মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম।

"এক-এক ক'রে প্রায় ছ'টি বৃহদাকার পিঁপড়ে আমাদের ঘরে ঢুকলো। তাদের এত কাছ থেকে নজর করবার কোনো সুবিধা এতদিন হয়নি। লক্ষ্য করলাম—একজনের ছাড়া তাদের বাকি সকলের আকৃতি এক। একজনের মাথার আকারটা একটু বৃহত্তর এবং মুখের শুঁড়গুলির রঙ্‌ও একটু আলাদা। কোনোপ্রকার শব্দ বা সংকেত শুনতে বা দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলাম যে, তারই আদেশে সব কাজ হচ্ছে! পিঁপড়েদের সর্দার ধীরে-ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ পেছনের পায়ে ভর দিয়ে, টেবিলের নিকট খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, আমার পরীক্ষার যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে পড়ে কী দেখলে ও কী বুঝলে, সেই-ই জানে। আমার পাশেই সেই কদাকার লোমশদেহ কীটটাকে দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এরাই মানুষের মতো প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে মানুষের সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, এক-চাপড়ে এই ঘৃণ্য-কীটটার ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে দিই। সে-ইচ্ছা দমন করেই অবশ্য রেখেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলাম না! এই অতিকায় পিঁপড়েদের গা থেকে এমন একটা উৎকট দুর্গন্ধ বের হয় যে, সে-দুর্গন্ধ সহ্য

করা কঠিন। পিঁপড়েটা আমার অতিনিকটে ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল, দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে তাকে ঠেলে দিলাম। ঠেলা যে বিশেষ জোরে হয়েছিল, তা নয়, কিন্তু সেই সামান্য ঠেলাতেই সে চারপাক খেয়ে ঘুরে একেবারে বহুদূরে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো। মনে হলো এবার আর নয়। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এদের আর বিলম্ব হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য! তাদের দলপতির এই অপমানে কোনো পিঁপড়েকেই একটুও বিচলিত হতে দেখলাম না। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়। তারা যেমন নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলো। দলপতিও খানিক বাদে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। দেখলাম, তার সামনের একটা পা ঐ সামান্য পড়াতেই ভেঙে গিয়েছে।

"দলপতি খাড়া হয়ে উঠেও কোনোপ্রকার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করলে না দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম। তাহলে এরা কী করতে চায়? কী এদের মতলব? কিন্তু সে-কথা ভাববার অবসর বেশি পেলাম না।

"হঠাৎ মনে হলো, আমার পা-গুলো ধীরে-ধীরে যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। সেই অবশতা পা থেকে ক্রমশ আমার দেহের ওপরদিকে উঠতে আরম্ভ করলো। সে-অবশতার ভেতর কোনো কষ্ট অনুভব করছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল, শরীরটা ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে এসেছে —এখন যেন একটু কোথাও গড়াতে পারলেই বেঁচে যাই। কিন্তু মিনিটখানেকের ভেতর যখন হঠাৎ মনে হলো যে, আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ—সমস্ত শক্তিই লোপ পেয়ে আসছে, তখন ভয়ঙ্কর ভীত হয়ে উঠলাম—একি ব্যাপার! এই কি মৃত্যু নাকি? ধীরে-ধীরে জ্ঞান লোপ পাচ্ছিল। এই আচ্ছন্ন-ভাবের বিরুদ্ধে সমস্ত মনের জোর দিয়ে

যুদ্ধ করেও সজ্ঞান থাকতে পারছিলাম না। সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়বার আগে এই আকস্মিক অবশতার কারণ বুঝতে পারলাম। স্পষ্টভাবে দেখলাম, প্রহরী পিঁপড়েদের একজনের ছু'টি সামনের পায়ে একটি রেডিও-সেটের মতো ছোট যন্ত্র রয়েছে। তার সামনের দিক থেকে একটা পিচকারির মতো নল উঁচিয়ে আছে, আর সেই নল দিয়ে একরকম বাষ্প এসে আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য পড়েনি, তার কারণও ছিল—সে-বিষবাষ্প বাতাসের মতোই বর্ণগন্ধহীন।

"জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হলো, আমি যেন কোন্ অতলে নেমে চলেছি। চারিদিক অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার! প্রথমে মনে হলো, এই কি মৃত্যুর পরের অবস্থা! পরের মুহূর্তেই একটি উৎকট ছুর্গন্ধ নাকে যাওয়ায় সে-ভয় দূর হয়ে গেল। উৎকট ছুর্গন্ধও যে মানুষের মনে আনন্দ দিতে পারে, আগে তা কখনো ভাবিনি। এখন এই ছুর্গন্ধ থেকে বুঝলাম যে, আমি বেঁচেই আছি—যদিও পিঁপড়েদের বন্দী। হাত বাড়িয়ে একটি পিঁপড়ের ঠাণ্ডা-গা স্পর্শ পর্যন্ত করলাম! অনেকদূর এই অন্ধকার দিয়ে নেমে গিয়ে হঠাৎ আলো চোখে পড়ল। অনেকটা আমাদের ইলেকট্রিক আলোর মতো; কিন্তু সেই আলোগুলির চারিধারে কোনো কাচের আবরণ নেই, বৈদ্যুতিক-শক্তিতেও তা জ্বলে না। পাথরের মতো এক-একটি নুড়ি নানাজায়গায় ছড়ানো, তা থেকেই এই আলো বের হয়। পরে জেনেছি, এই আলো বিজ্ঞানে পিঁপড়েরা মানুষকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। তাপহীন যে-আলো আবিষ্কার করবার চেষ্টায় মানুষের বিজ্ঞান এখনো অক্ষম, পিঁপড়েরা তাই বের করেছে। সেই আলোর ওপরদিকে একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ চোখে পড়ল, তার মাঝখান দিয়ে তামার একটি 'রড' বসানো। সেই 'রড'

বেয়েই আমাদের লিফ্‌টের মতো ঘরটি নেমে এসেছে। বুঝলাম, পৃথিবীর ওপরের স্তর থেকে নেমে একরকম পিঁপড়েদের পাতালেই নেমে এসেছি। বড়-বড় খনিতে যেমন দেখা যায়, এখানেও তেমনি—চারিধারে অনেক সুড়ঙ্গ চলে গেছে। সেই সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে অসংখ্য পিঁপড়ে যাতায়াত করছে। সমস্ত সুড়ঙ্গ-পথটি আলোকিত। সে-আলো এত উজ্জ্বল যে, দিন বলে ভ্রম হয়!

"আমার জ্ঞান হলেও হাত-পা তখনো অবশ। আমাকে ঠেলাগাড়ির মতো একটা গাড়িতে পিঁপড়েরা চাপিয়ে দিলে। ভাবলাম, তারা বুঝি ঠেলেই কোথাও নিয়ে যাবে; কিন্তু ছেড়ে দেওয়ামাত্র গাড়িটি আপনা-থেকেই চলতে আরম্ভ করলো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গাড়িটিতে না আছে বাষ্পের ইঞ্জিন, না আছে মোটর! প্রথমে এই গাড়ি পিঁপড়েদের বিজ্ঞানের আর-এক কীর্তি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে এ-গাড়ি রহস্য জানতে পেরে না-হেসে থাকতে পারিনি। গাড়িটি আমাদের ঘোড়ার গাড়ির জাতভাই, শুধু ঘোড়ার বদলে এ-গাড়ি যারা টানে, তাদের নাম শুনলে বিস্মিত হবে। এ-গাড়ির বাহন গণেশের বাহনের মতো বড়-বড় মেঠো ইঁদুর। অতিকায় পিঁপড়েরা এই একটিমাত্র জানোয়ারকে বশ করেছে ও কাজে লাগিয়েছে। মাটির তলায় আর কোন্ জানোয়ারই বা তাদের কাজে লাগতে পারে। এই ইঁদুরগুলিকে কিন্তু কি আশ্চর্যরকম শিক্ষিত তারা করেছে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। মানুষ অনেক জানোয়ার বশ করেছে, কিন্তু পিঁপড়েদের ইঁদুর-বাহনেরা যেভাবে—যেরকম বুদ্ধি খাটিয়ে মনিবদের কাজ করে, মানুষের বশ-করা কোনো জানোয়ারকে তো সেরূপ করতে দেখিনি। এই ইঁদুর দিয়েই পিঁপড়েরা তাদের ছোট-খাটো সমস্ত কাজ করায়। পিঁপড়েদের গাড়ির তলায় প্রায় গুটি-

বিশেক ইঁদুর জোতা থাকে। ওপর থেকে তাদের দেখা যায় না। আদেশ পাওয়ামাত্রই তারা শিক্ষিত ঘোড়ার মতো গাড়িটি টেনে নিয়ে যায়। আর গাড়ির বেগও বড় কম হয় না। মজার কথা এই যে, এই মুষিকদের কোনো চালকের প্রয়োজন হয় না, তারা নিজেরাই যেন জানে যে, কোথায় থামতে হবে! অন্তত আমার বেলা তো তাই হলো। একজায়গায় গিয়ে গাড়ি থেমে গেল। সেখানে পিঁপড়েরা যে-ভাবে আমায় নামিয়ে গিয়ে গেল, তাতে বুঝলাম—তারা আমার আসার কথা আগে থেকেই জেনে প্রস্তুত হয়ে ছিল। আমাকে তারা যেখানে নিয়ে গেল, সেটি একটি প্রকাণ্ড হলঘরের মতো জায়গা। সুড়ঙ্গটি এখানে চওড়া হয়ে এই আকার নিয়েছে। পিঁপড়েদের নিজস্ব ঘর বলে কিছু নেই। তারা অনেকে মিলে এমনি এক-একটি হলঘরে দরকার হলে এসে বিশ্রাম ও আহারাদি করে। আমাকে হলঘরের একটি কোণে এনে তারা শুইয়ে দিলে। তখন আমার ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়-ক্লান্তিতে শরীরের এমন অবস্থা যে, একটু গড়াতে পারলেই বাঁচি। আমি সেখানে কাত হয়ে পড়লাম। ক'দিন ধরে অজ্ঞান ছিলাম, জানি না। অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পেয়েছিল, কিন্তু সেকথা জানাবোই বা কাকে এবং জানালেই বা কী হবে! আমার বন্দীজীবন সেইদিন থেকেই আরম্ভ হলো।

"কিন্তু আমি না জানলেও পিঁপড়েরা মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভোলেনি, দেখা গেল। পিঁপড়েদের ইঁদুর-ভৃত্যের কথা তখনো জানি না। হঠাৎ বড়-বড় গুটি-চার-পাঁচ ইঁদুরকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি আঁত্‌কে উঠলাম। ইঁদুরগুলি কিন্তু কোনো-রকমে বিচলিত না হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের মুখে একটি ক'রে জিনিস। সেগুলি নামিয়ে রেখে তারা

আবার চলে গেল। সে-জিনিসগুলি যে আহার্য, প্রথমে তা বুঝতে পারিনি, কৌতূহলভরে সেগুলি নেড়ে-চেড়ে দেখতে-দেখতে একটা জিনিস যেন মুলোর মতো মনে হলো। তখন আর ভাববার অবসর ছিল না। অন্য জিনিসগুলি বাদ দিয়ে সেই মুলোর মতো জিনিসটাতে এক কামড় দিলাম। জিনিসটা কোনো গাছের মূলই বটে, কিন্তু স্বাদ তার মুলোর মতো নয়। স্বাদ যে বিশেষ ভালো, তাও বলতে পারি না ; কিন্তু সেদিন তাই-ই অমৃতের মতো লেগেছিল। জিনিসটা রসাল, ক্ষুধা-তৃষ্ণা তুই-ই তার দ্বারা কতকটা নিবৃত্ত হলো। খাওয়ার পর ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, বলতে পারি না।

"তারপর পিঁপড়েদের সঙ্গে যে পাঁচবছর কাটিয়েছি, তার বিস্তৃত-বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। অবশ্য একথা জানি যে, বিশদভাবে জানালেও সেই দীর্ঘ-বিবরণ একঘেয়ে লাগবে না। কারণ প্রত্যেক-দিনই ঐ অদ্ভুত জাতের যে-সব নতুন-নতুন ব্যাপার আমি জানতে পেরেছি, মানুষের জ্ঞানের দিক থেকে তার প্রত্যেকটিই চমকপ্রদ! আপাতত সংক্ষেপে পিঁপড়েদের সমাজগঠন প্রভৃতি জানাবার চেষ্টা করবো। কেমন ক'রে পিঁপড়েরা ধীরে-ধীরে আমায় একটু-একটু স্বাধীনতা দিতে শুরু করলে, কেমন ক'রে পিঁপড়েদের নানা ব্যাপার জানবার সুযোগ আমার হলো, কেমন ক'রে শেষপর্যন্ত আমার সেখানে একরকম প্রভাব-প্রতিপত্তি পর্যন্ত হলো, তার বিশদ বর্ণনা আমি করবো না, শুধু পিঁপড়েদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে প্রথম যা প্রয়োজন—অর্থাৎ তাদের ভাষা-শিক্ষা—কেমন ক'রে তা আমার হলো, তাই একটু জানাবো।

"পিঁপড়েরা আমায় তখন স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি যেখানে-সেখানে বেড়িয়ে বেড়াই, সময়মতো আহার পাই ও নিশ্চিন্ত হয়ে

ঘুমোই। চোখ দিয়ে দেখে যেটুকু বোঝবার, তার বেশি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না। পিঁপড়েদের কোনোদিন শব্দ করতে শুনিনি। তারা কি ক'রে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে, কি ক'রে কাজ চালায়, এই ভেবে আমার বিস্ময় লাগে। এমন সময় একদিন কয়েকটি পিঁপড়ে আমার ঘুম-ভাঙার পর আমার বিশ্রাম-স্থানে এসে হাজির হলো। তাদের ভেতর একটি পিঁপড়ের মাথাটি অত্যন্ত বৃহৎ, দেখে বুঝলাম যে, সে সর্দার-টর্দার হবে। বিস্তীর্ণ সেই সুড়ঙ্গ-ঘরের নানা জায়গায় তখন অন্যান্য পিঁপড়েদের কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ সবে জেগে উঠেছে। বড়-মাথাওয়ালা পিঁপড়েটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী দেখলে, সে-ই জানে। দেখলাম, তার মুখটা নড়ছে, কিন্তু কোনো শব্দ সেখান থেকে শুনতে পেলাম না। অনেকক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে কী আদেশ করলে জানি না, কিন্তু একটি পিঁপড়ে একটি ছোট গ্রামোফোনের সাউণ্ড-বক্সের মতো যন্ত্র নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো। সামনের ছু'পা দিয়ে সেই যন্ত্রটি সে হঠাৎ আমার কানে লাগিয়ে দিলে। আমি প্রথমত প্রতিবাদ ক'রে যন্ত্রটি ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পরে অনিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে এতদিন বাদে তারা নিশ্চয়ই আসেনি, জেনে চুপ ক'রে সব সহ্য করলাম। যন্ত্রটা পরাবার সময় কানে প্রথমটা একটু লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, যেন চারিধারে অদ্ভুত কোনো শব্দ শুনছি। প্রথমটা বুঝতে পারলাম না বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সামনের দিকে চেয়ে বড়-মাথাওয়ালা পিঁপড়েকে মুখ নাড়তে দেখে সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এতক্ষণ হঠাৎ তার মুখ থেকে শব্দ শুনতে পেলাম। তার মানে অবশ্য বুঝতে পারলাম না বটে, কিন্তু এতদিনে পিঁপড়েদের কথা শুনতে পাওয়ার আনন্দেই তখন আমি বিভোর। মনের আনন্দে

নিজেই 'সাবাস ভাই' বলে ফেলেছিলাম। দেখলাম, আমি কথা বলা মাত্র পিঁপড়েটা অমনি এক-প্রকার যন্ত্র তার নিজের কানে লাগালো। বুঝলাম, আমাদের শব্দও সে এইভাবে শোনবার চেষ্টা করছে। পিঁপড়েটা তারপর বহুক্ষণ কথা কইল, কিন্তু তার শব্দ শুনতে পেলেও অর্থ বুঝতে না পেরে মনে হচ্ছিল, এমনভাবে শব্দ শুনতে পেয়েই বা লাভ কি? কিছুক্ষণ বাদে পিঁপড়েটি নিজে থেকেই তাদের ভাষা আমায় শিক্ষা দেওয়ার উপায় ক'রে নিলে। রাত্রের আহার্যের কিছু-কিছু তখনো আমার শয্যাপার্শ্বে পড়ে ছিল, সেই-দিকে একটা পা বাড়িয়ে সে একটা শব্দ করলে, আমিও সঙ্গে-সঙ্গে বললাম—'খাবার।' পিঁপড়েটা পূর্বের মতো শব্দ আর কয়েকবার ক'রে আমায় বুঝিয়ে দিলে যে, খাবারের প্রতিশব্দ পিঁপড়েদের ভাষায় কী হয়।

"এরপর পিঁপড়েদের ভাষা-শেখা আমার খুব তাড়াতাড়িই হতে লাগলো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেই বড়-মাথাওয়ালা পিঁপড়েটা আমার সঙ্গে-সঙ্গে থেকে আমায় কয়েক মাসের মধ্যেই এমন তালিম ক'রে তুললে যে, তাদের ভাষা শুধু বোঝা নয়, কতকটা বলতে পর্যন্ত আমি পারলাম! এখন থেকে পিঁপড়েদের বিস্তারিত-বিবরণ-সংগ্রহ আমার পক্ষে সম্ভবপর হলো।

কানের যে-যন্ত্রের দ্বারা পিঁপড়েদের ভাষা আমি বুঝলাম, তার এবং কেন পিঁপড়েদের শব্দ মানুষ শুনতে পায় না, সে-বিষয়ের একটু ব্যাখ্যা এখানে প্রয়োজন। তোমরা জানো কি না জানি না যে, মানুষের কান দিয়ে আমরা যে-শব্দ শুনতে পাই, তা ছাড়া আরো অনেক শব্দ পৃথিবীতে হচ্ছে। সে-শব্দ এত বেশী তীব্র যে, আমাদের কান তা ধরতেই পারে না। আবার অত্যন্ত ধীর-শব্দও আমরা

স্বাভাবিক কান দিয়ে ধরতে পারি না। আমরা যে-শব্দ শুনি, তা মাঝামাঝি আওয়াজ ; কিন্তু অতিকায় পিঁপড়েদের আর কিছু না থাক, গলার আওয়াজ এমন প্রচণ্ড যে, মানুষের কান তা ধরতেই পারে না। তাই পিঁপড়েদিগকে আমাদের বোবা বলেই মনে হতো। আমাদের শব্দ করার শক্তি পিঁপড়েদের মতো প্রচণ্ড নয় বলে আমাদের শব্দও পিঁপড়েদের কানে যেত না। যে-যন্ত্র পিঁপড়েরা আমার কানে পরিয়ে দিয়েছিল, সেটিকে শব্দশোধন-যন্ত্র বলা যেতে পারে। তার ভেতর দিয়ে পিঁপড়েদের চড়া-শব্দ নরম হয়ে আমাদের কানের উপযোগী হয়ে যায় বলেই আমি তাদের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। আবার আমার মৃদু-শব্দও তাদের কানের মতো চড়া ক'রে নেওয়ার জন্যে পিঁপড়েরা নিজেদের কানে অন্যরকম যন্ত্র ব্যবহার করেছিল। সেদিন থেকে সেই যন্ত্রের সাহায্যেই আমাদের কথাবার্তা চলতে শুরু হয়। আমাদের কানের এই রহস্য বুঝে যে বৈজ্ঞানিক পিঁপড়ে এই যন্ত্র আবিষ্কার করে—শত্রু হলেও তাকে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।

"পিঁপড়েদের সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু বলবার নেই। সাধারণ ছোট পিঁপড়েরা কীভাবে বাস করে, তা বোধহয় তোমরা জানো। তাদের ভেতর একজন থাকে রানী। সে-ই ডিম পাড়ে ও তার ডিম থেকেই সমস্ত পিঁপড়ের জন্ম হয়। দু'-একটি পুরুষ-পিঁপড়ে ছাড়া আর বাকি সমস্তই পিঁপড়ের রাজ্যে শ্রমিক, তারা রানীর জন্যে খেটে মরে মাত্র। অতিকায় পিঁপড়েদের সমাজ-ব্যবস্থা প্রায় এই-রকমই, শুধু তাদের ভেতর কোনো রানী নেই। তাদেরও অধিকাংশ পিঁপড়ে শুধু দাসবৃত্তি ক'রে জীবন কাটায়—তাদের না আছে ঘর, না আছে স্ত্রী-পুত্র। কিন্তু তাদের ওপরে একদল পিঁপড়ে থাকে,

পালন, শাসন প্রভৃতি সমস্ত কাজ তারাই করে। তারা পিঁপড়েদের রাজবংশ। তারা অনেকটা মানুষের মত স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পরিবার বেঁধে থাকে। যা-কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা, রাজ্য-পরিচালনা, যুদ্ধে নেতৃত্ব —তাদের দ্বারাই হয় এবং তাদেরই ছেলেপুলেদের ভেতর যাদের বুদ্ধি অল্প ও ক্ষমতা কম, তাদের ছেলেবেলো থেকেই দাস ক'রে দেওয়া হয়। দাস-পিঁপড়েরা বিয়েও করে না, তাদের ছেলেপুলে-সংসারও হয় না। তাই বলে তারা অসন্তুষ্টও নয়—আর তারা উৎপীড়িতও হয় না। পিঁপড়েদের রাজবংশের এক-একটি দম্পতির ছেলেপুলে হয় অসংখ্য। ডিম ফুটে বেরুবার পরই বৈজ্ঞানিকেরা এসে তাদের পরীক্ষা ক'রে যায় এবং প্রাচীন স্পার্টানদের মতো তাদের ভেতর একেবারে যারা অকর্মণ্য, তাদের মেরে ফেলে, অপেক্ষাকৃত নির্বোধদের দাস ক'রে দিয়ে বাকি শিশু-পিঁপড়েদের ভেতর কার মাথা কোন্‌দিকে খেলবে, আগে থেকে বুঝে সেইদিকে তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। শিশু-অবস্থাতেই প্রত্যেকের শক্তি-বিচারের বিদ্যায় পিঁপড়েরা যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে, মানুষ তা ভাবতেই পারে না। পিঁপড়েদের ভেতর রাজা নেই। অনেকটা আমাদের গণতন্ত্রের মতো। তাদের রাজবংশের মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে একসভায় বসে রাজকার্য পরিচালনা করে। সেখানে বিশেষ মতভেদ বা গোলমাল কখনো হয় না। কারণ, যার মাথা ইঞ্জি-নিয়ারিংএ খোলে, সে কখনো রাজনীতিতে মাথা ঘামাতে আসে না।

“পিঁপড়েদের ভেতর বড়লোক কেউ নেই, গরিবও না। যার যা দরকার, রাজভাণ্ডার থেকে সবাই তাই পায়। একদল পিঁপড়ে শুধু এই কাজেই আছে। পিঁপড়েরা কেউ কিছু সঞ্চয় করে না, সুতরাং অর্থ নিয়ে মারামারি-কাটাকাটি সেখানে নেই। যে-যার নিজের কাজ

করতে পেলেই তারা সন্তুষ্ট।

"কিন্তু জ্ঞানে, বিদ্যায়, সমাজ-গঠনে তারা বিশেষ অগ্রসর হলেও কলাবিদ্যা তাদের নেই বললেই হয়। রাজবংশের পিঁপড়েদের মাঝে-মাঝে কাজের অবসরে একত্র হয়ে নাচের মতো একরকম মজলিশ করতে দেখেছি, এ-ছাড়া গান-বাজনা, ছবি-আঁকা বা চৌষট্টিকলার কোনোটিরই তাদের চর্চা নেই।

"স্নেহ, দয়া, মমতা প্রভৃতি বৃত্তিরও তাদের একান্ত অভাব। তারা শুধু ন্যায়বিচারই জানে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানও তাদের অদ্ভুত।

"এখন কী ক'রে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম, সংক্ষেপে তা বলে এ-কাহিনী শেষ করবো।

"পিঁপড়েদের ভেতর পাঁচ বৎসর থেকে তাদের ভাষা শিখে তাদের ভেতর প্রতিপত্তি লাভ করা সত্ত্বেও মানুষের সংসর্গের জন্যে মন আমার অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। শুধু পালানো অসম্ভব জেনেই চুপ ক'রে থাকতাম। একদিন কিন্তু অভাবনীয়রূপে সে-সুযোগ এসে গেল। রায়ো-ডি-জানেইরো'র কাছে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। একদিন হঠাৎ সে-ভূমিকম্প একটু ভীষণভাবে দেখা দিল। ভূমিকম্প হওয়া-মাত্র পিঁপড়েদের নিয়ম— নিচের গর্ত থেকে ওপরে—মাটির ওপরে বেরিয়ে যাওয়া। আমি যেমন সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমেছিলাম, সেরকম সুড়ঙ্গ সেখানে আর প্রায় পঞ্চাশটি আছে। ভূমিকম্প আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সার বেঁধে পিঁপড়েরা দলে-দলে বেরিয়ে পড়তে লাগলো। পিঁপড়েদের দলের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। পিঁপড়েরা ব্যস্ত হতে জানে না—শুধু এই ভূমিকম্পেই তাদের যা বিচলিত হ'তে দেখেছি। এক-একদল ক'রে লিফ্‌টের মতো খাঁচায় ঢুকে আমরা ওপরে উঠে এলাম। অন্যান্য অনেকবার দেখেছি, ওপরে উঠতে-না

উঠতেই ভূমিকম্প থেমে যায়; কিন্তু এবারে ভূমিকম্প অত্যন্ত ভীষণ হয়ে উঠলো। আমাদের দল ওপরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই সুড়ঙ্গ-পথটি ধ্বসে নিচে পড়ে গেল। চারিদিকে তখন ভীষণ বিশৃঙ্খলা; প্রতি-মুহূর্তে পায়ের তলার মাটি ধ্বসে পড়তে পারে জেনে পিঁপড়েরা ব্যাকুলভাবে যেদিকে-সেদিকে ছুটতে শুরু করেছে। আমিও প্রাণভয়ে একদিকে ছুট্ দিলাম। ভূমিকম্পের সঙ্গে-সঙ্গে আকাশে তখন ভয়ানক ঝড়ও উঠেছে। সেইসঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। খানিকদূর ছোটবার পর দেখলাম—চারিধারে কোথাও কোনো পিঁপড়ের দেখা নেই। এতদিন পিঁপড়েদের সঙ্গে বাস ক'রে তাদেরই সঙ্গী ও সহায় বলে ভাববার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটা সত্যিই অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম। ভূমিকম্পে তখন নানাজায়গায় মাটি ফেটে আগুন ও ধোঁয়া বেরুতে আরম্ভ করেছে। পিঁপড়েদের ভাষায় চিৎকার ক'রে ডাকলাম। এই মানুষশূন্য-আমেরিকায় একমাত্র পরিচিত পিঁপড়েদের আশ্রয়চ্যুত হয়ে আমি কোথায় যাবো! কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি কথা হঠাৎ মনে হওয়ায় আমার কণ্ঠের ডাক আপনিই থেমে গেল। এই তো মুক্তির সুযোগ! পিঁপড়েরা হাজার ভালো ব্যবহার করলেও চিরদিন আমায় নজরবন্দী ক'রে রাখবে, কোনোদিন মানুষের মাঝে ফিরতে দেবে না। আমি যে তাদের অনেক কথা জানি। হয় মৃত্যু, নয় মুক্তির এই তো সুযোগ! পিঁপড়েদের দেখা পাওয়া নয়, কোনোরকমে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়াই হলো আমার উদ্দেশ্য, প্রাণপণে তাই ছুটতে লাগলাম।

"ভূমিকম্প যখন থামলো, পিঁপড়েদের ঘাঁটি থেকে তখন আমি অনেক দূর এসে পড়েছি। এইবার আমার খোঁজ পড়বে, জেনে ক্লান্তপদেও আরো এগিয়ে চলতে লাগলাম। আমার একমাত্র মুক্তির

উপায় সমুদ্র-তীরে পৌঁছে কোনোরকমে ভেলা তৈরি ক'রে সমুদ্রে ভাসা। সে-সমুদ্রে যদি মৃত্যুও হয়, তবুও ভালো, তবু তো আকাশের তলায় ফাঁকা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে মরতে পারবো। ইঁদুরের মতো মাটির নিচে মরতে হবে না।

"কেমন ক'রে সমুদ্রতীরে পৌঁছে ভেলা তৈরি ক'রে ভেসে পড়েছিলাম ও কেমন ক'রে আমার উদ্ধার হয়, তার কথা সব সংবাদপত্রেই বেরিয়েছে; সুতরাং তার আর পুনরাবৃত্তি ক'রে কাহিনী বাড়াবো না।

"পরিশেষে বলতে চাই যে, মানুষ আবার দক্ষিণ-আমেরিকা অধিকার করবার আয়োজন করছে—কিন্তু আমার সে-আয়োজনের প্রতি আর আস্থা নেই। দক্ষিণ-আমেরিকা অধিকার করা তো দূরের কথা, মানুষের বর্তমান অধিকারগুলি এই দুর্ধর্ষ কীটেদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই একদিন আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বলে আমার বিশ্বাস। পিঁপড়েদের আমি যে-রকম ক'রে জানবার সুযোগ পেয়েছি, তাতে এরকম বিশ্বাস আমার সহজেই জন্মেছে।"


আকাশের আতঙ্ক

আজকালকার খবরের কাগজের দিনে আমরা নিত্যনূতন বিস্ময়কর খবর শুনতে শুনতে কিরকম মিথ্যা উত্তেজনার মধ্যে যে বাস করি—একদিন যে খবর আমাদের অবাক ক'রে দেয়, পরের দিন আরো বিস্ময়কর ঘটনায় সে-খবর কেমন অনায়াসে আমাদের মনে চাপা পড়ে যায়, তার প্রমাণের অভাব নেই।

বেশিদূরে যেতে হবে না। ১৯—সালের বৈশাখ মাসের কথা। খবরের কাগজগুলো একদিন স্যার চিরঞ্জীব রায়ের অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর খুনের মামলা নিয়ে তুমুল হৈ চৈ বাধিয়ে তুলেছিল। হপ্তাখানেক ধরে খবরের কাগজে আর অন্য কথাই বুঝি ছিল না। সোজা কথা তো নয়। স্বয়ং স্যার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ। স্যার চিরঞ্জীব ইদানীং একটু যেন কেমন অবশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে মস্তিষ্ক-বিকৃতির একটা গুজব চারিধারে শোনা যেতে আরম্ভ করেছিল; কিন্তু তা বলে এতটা কেউ কি কল্পনাও করতে পারে! তাঁর পূর্বকীর্তির কথা তখনো তো লোকে ভোলে নি। স্যার উপাধির দ্বারা তো তাঁর পরিচয় নয়, তাঁর পরিচয় বাংলার বরপুত্র ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে। পৃথিবীর শৈশবাবস্থার সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীর কঙ্কালের খোঁজে মধ্য-এশিয়ায় তিনি যে বৈজ্ঞানিক অভিযানের নেতৃত্ব করেন, সে-অভিযানের অসামান্য সার্থকতায় সমস্ত পৃথিবীর কাছে বাংলার মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল। বাংলা থেকে এরকম অভিযান যে হতে পারে, তা কেউ আগে ভাবতে পারে নি। তাঁর দ্বিতীয় অভিযান প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার জন্যে নিউগিনির অনাবিষ্কৃত প্রদেশে। সে-অভিযানের ফলে প্রাণিবিদ্যা আশাতীতভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ বুঝি দেখা দেয়। তাঁর অদ্ভুত সব নতুন মতামত শুনে বৈজ্ঞানিক

সমাজ তাঁর মাথা ঠিক আছে কিনা, সন্দেহ প্রকাশ করে। স্যার চিরঞ্জীব চিরদিন অত্যন্ত অহঙ্কারী প্রকৃতির। খ্যাতির শিখরে যতদিন তিনি আরূঢ় ছিলেন, ততদিন তাঁর প্রতিভার খাতিরে এ-অহঙ্কার সকলে নিঃশব্দে সহ্য করেছে, কিন্তু তাঁর মানসিক দুর্বলতার পরিচয় যেদিন তাঁর অদ্ভুত কথাবার্তা ও মতামতের মধ্যে পাওয়া যেতে লাগল, সেদিন কেউ কেউ যে আগেকার আক্রোশের শোধ নিতে ছাড়লে না, একথা বলাই বাহুল্য। কাগজে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ ক'রে অনেক প্রবন্ধও বেরুল। প্রাচীন যুগের বিলুপ্ত এক ডাইনোসরের পিঠে চড়ে স্যার চিরঞ্জীব শহরের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই ব্যঙ্গচিত্রটি তখনকার দিনে বিশেষ হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। ব্যঙ্গচিত্রটি অকারণে আঁকা হয় নি। বুদ্ধি-ভ্রংশের সঙ্গে সঙ্গে স্যার চিরঞ্জীবের অদ্ভুত এক ধারণা হয়েছিল যে, মেসোজোইক যুগের সরীসৃপের কঙ্কাল বলে বৈজ্ঞানিকেরা যেগুলি লক্ষাধিক বছরের পুরোনো মনে করেন, সেগুলি নাকি অত পুরোনো মোটেই নয়। তিনি নাকি এমন সব ডাইনোসরের হাড় পেয়েছেন, যেগুলিকে আধুনিককালের বলে নিশ্চিত বোঝা যায়। তা ছাড়া তাঁর মতে সরীসৃপ-বংশ নাকি এখনো একেবারে লুপ্ত হয় নি।

নানাদিক থেকে আঘাত খেয়ে আহত-অভিমানের জন্যেই কিনা বলা যায় না, স্যার চিরঞ্জীব শেষাশেষি একবারে নিঃসঙ্গই থাকতে আরম্ভ করেছিলেন। শহরের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর নির্জন বিশাল বাড়ির পরীক্ষাগারের বাইরে তাঁর আর দেখাই পাওয়া যেত না। নিজেকে যেন তিনি সেখানে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে কোনো কাগজ মজা করবার জন্যে বা অনুগ্রহ ক'রে তাঁর যে দু-একটা লেখা ছাপত, তাতেই তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যেত। সে-সমস্ত

লেখার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যে মানসিক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যেত, তাতে শত্রুপক্ষ হাসলেও অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক-সমাজ এত বড় মনীষীর এমন পতনে বেদনাই অনুভব করতেন। কিন্তু ঘরে বসে আজগুবি সব ধারণা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা এক কথা, আর মানুষ-খুনের দায়ে আসামী হওয়া আরেক কথা। একথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

সে-ঘটনার কথা মনে করলেও গা শিউরে ওঠে। শুধু সাধারণ হত্যা সে তো নয়, তার ভেতর যে উন্মত্ত পৈশাচিকতার পরিচয় ছিল, তাতেই সকলে বেশি স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। স্যার চিরঞ্জীবের নির্জন বাগান-বাড়িতে হঠাৎ একদিন তাঁর একটি ভৃত্যকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণভাবে সে খুন হয় নি। বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া অমন নৃশংসভাবে নরহত্যা কেউ করতে পারে না। চাকরটির দু'টি চোখ ওপড়ান এবং তার সর্বাঙ্গের আঘাত দেখে মনে হয়, ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেউ যেন তার সারাগায়ের মাংস উন্মত্তভাবে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিয়েছে।

স্যার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে এ-সম্পর্কে সবচেয়ে সন্দেহের কারণ এই যে, তাঁকে যখন ধরা হয়, তখন তিনি দমদম থেকে একটা এরোপ্লেন ভাড়া ক'রে পালাবার চেষ্টা করছেন। পুলিশ খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ না করলে তাঁকে ধরতেই পারতো না। এরোপ্লেনে তিনি উঠে বসে চালাবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় পুলিশ দ্রুতগামী মোটরে গিয়ে তাঁকে ধরে। পুলিশের আদেশেও প্রথমে তিনি নামতে রাজী না হয়ে তাদের সামনেই প্রপেলার চালিয়ে দিয়ে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বাধ্য হয়ে পুলিশ-অফিসার তখন গুলি ক'রে তাঁর প্রপেলার ভেঙে দিয়ে তাঁকে থামায়। এরোপ্লেনে তাঁর সঙ্গে একটি

বন্দুকও পাওয়া গেছিল।

এরোপ্লেন থেকে নামবার পরও তাঁর রোক কমে নি। পুলিশের লোককে যা নয় তা বলে গাল দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে জেদ করেন ; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে কিছুই তিনি বলতে চান না। তাঁর চাকরের হত্যা-সম্বন্ধেও তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি। মস্তিষ্ক-বিকৃতির পর তাঁর অহঙ্কারী প্রকৃতি যেন আরো উগ্র হয়ে উঠেছিল। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে, তাঁকে যখন অকারণে ধরে অপমান করা হয়েছে, তখন তাদের কোনো কথার আর তিনি জবাব দেবেন না।

এই বিখ্যাত নরহত্যার মামলা আদালতে ওঠার পর কয়েকদিন পর্যন্ত খবরের কাগজগুলির উত্তেজনার আর অবধি ছিল না। মানুষের মুখে-মুখেও এই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে নানান অতিরঞ্জিত আজগুবি খবর তখন ফিরেছে!

তারপর এই রোমাঞ্চকর হত্যার খবর কোথায় যে গেল তলিয়ে, কেউ তার সন্ধানও রাখলে না। দার্জিলিঙের বিমান-ডাকের ভয়ঙ্কর রহস্য তখন মানুষের মন ও সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে বসেছে। তখন সবে কলকাতা থেকে দার্জিলিঙ পর্যন্ত এরোপ্লেনে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ডাকবাহী বিমানপোত আশ্চর্যভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঘন টেরাই-এর জঙ্গলে ভাঙা এরোপ্লেনটির সন্ধান যদি বা মিলল, তার চালকের কোনো পাত্তা নেই। কেমন ক'রে যে এরোপ্লেনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, তারও কোনো সন্তোষ-জনক মীমাংসা হলো না।

শুধু এই ব্যাপারেই শেষ হলে হয়তো সাধারণের আতঙ্ক এত বেশি

হতো না ; কিন্তু এ-ব্যাপারের রহস্য আরো গভীর হয়ে উঠল পরের ঘটনায়। একজন ইংরেজ বিমানবীর জলপাইগুড়ি থেকে এরোপ্লেনে কলকাতা আসছিলেন তার পরের দিন ভোরের বেলা ; কিন্তু যাত্রা করবার খানিক বাদেই তাঁর এরোপ্লেনটিও অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়ে তিস্তানদীর ওপর। তিস্তার অনেক জেলে নৌকো থেকে তাঁর পড়ার দৃশ্য দেখেছিল। তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানা যায় যে, ভোরের আগে আব্‌ছা অন্ধকারে তারা চোখে ভালো না দেখতে পেলেও এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ ঊর্ধ্ব-আকাশ থেকে কিরকম বেয়াড়াভাবে এরোপ্লেনটি মাতালের মতো পাক খেতে খেতে নামতে থাকে। নিচে নেমেও এরোপ্লেনটি আর একবার ওপরে গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতো উঠেছিল ; কিন্তু বেশিদূর নয়। তারপর সশব্দে তিস্তার জলে সেটি ভীষণ বেগে এসে পড়ে। এবারে এরোপ্লেনের ভেতর ইংরেজ-চালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সমস্ত মুখ ক্ষত-বিক্ষত এবং একটি চোখ খোবলানো।

এই ভয়ঙ্কর খবর বাসি হতে না হতেই পরের দিন সংবাদ পাওয়া যায় যে, দার্জিলিঙ্ থেকে সন্ধ্যায় ফেরার সময় আর একটি ডাকবাহী বিমানপোত টেরাই-জঙ্গলের ওপর পুবদিকের আকাশ-প্রান্তে দু'টি অদ্ভুত-আকারের বিমানপোত দেখেছে। ভালো ক'রে লক্ষ্য করবার আগেই সেগুলি সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে যায়।

এই রহস্যময় দু'টি অজানা বিমানপোতের খবরে দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সাড়া পড়ে গেল। ভালো ক'রে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, আই. এন. এ. অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজে'র জানিত কোনো এরোপ্লেন সেদিন ওদিকে যায় নি।

তা ছাড়া বিমান-ডাকের চালক যেরকম বর্ণনা দিয়েছিল, সে-ধরনের বিমানপোত ভারতের কোথাও নেই।

নতুন এই আতঙ্কের হুজুগে চিরঞ্জীব রায়ের মামলা কোথায় চাপা পড়ে গেল, কে জানে। খবরের কাগজের কোণে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লোকের বোধহয় আর চোখেও পড়ে না।

প্রত্যেকে আমরা তখন খবরের কাগজ খুলেই এরোপ্লেন রহস্যের সংবাদ রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়তে আরম্ভ করি; প্রতিদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি এ-রহস্যের ওপর নতুন কোনো আলোকসম্পাত হলো কিনা তা জানবার আশায়।

হাজার রকমের গুজব ও আলোচনা চারিধারে চলতে থাকে। এই অদ্ভুত অজানা বিমানপোত দু'টি কাদের? যে দু'টি এরোপ্লেন আশ্চর্যভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের ভেঙে পড়ার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা? আপাতত কোনো দেশের সঙ্গে যখন আমাদের কিংবা কারুর যুদ্ধ বা বিরোধ নেই, তখন এমনভাবে কারা নিরীহ আকাশ-পথের যাত্রীদের আক্রমণ করছে? তাদের উদ্দেশ্যই বা কি? এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই কেউ দিতে পারলে না। শুধু চারিধারে আতঙ্কই বেড়ে যেতে লাগল।

আই. এন. এ. বাধ্য হয়ে বাংলার উত্তরাঞ্চলে রাত্রে এরোপ্লেন চালানো নিষেধ ক'রে দিলে, কারণ দেখা গেল যে, বেশির ভাগ দুর্ঘটনা রাত্রে ওই অঞ্চলেই ঘটছে। ডাকবাহী বিমানপোত ও ইংরেজ-চালকের এরোপ্লেনের পর আরো তিনটি এরোপ্লেন ওই অঞ্চলে রাত্রে ভেঙে পড়ে। অধিকাংশ আরোহীর পাত্তা পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলেও দেখা গেছিল, তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন।

শুধু আকাশ-পথের এরোপ্লেনই নয়, সাধারণ লোকও আক্রান্ত

হয় কেউ কেউ। রংপুরের একটি গ্রামের রাস্তায় একদিন সকালে একজন চাষীর ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। সে তার হারানো বলদের খোঁজে রাত্রে বাইরে বেরিয়েছিল। অনেকে অবশ্য এ-ব্যাপারটির সঙ্গে রহস্যময় এরোপ্লেন দু'টির কোনো সংশ্রব আছে, তা স্বীকার করতে চান না ; কিন্তু সেই গ্রামের একজন বৃদ্ধ বলে যে, সেদিন রাত্রে আকাশে অদ্ভুত একরকম আওয়াজ সে শুনেছিল।

সতি-মিথ্যা নানারকম খবর এইবার রটতে থাকে। হুজুগের দিনে খবরের কাগজগুলি বাছবিচার না ক'রে তার সবগুলিকেই প্রায় স্থান দেয় নিজের পাতায়। আমাদের কাগজের মফঃস্বল-বার্তাগুলি একেই যত গাঁজাখুরী সংবাদের ডিপো। মফঃস্বলের প্রতিনিধিরা সুযোগ পেয়ে যা খুশি আষাঢ়ে-গল্প সেখানে চালাতে লাগল। কোথায় জলপাইগুড়ি অঞ্চলের এক গাঁয়ে এক বুড়ির একটা বাছুর হারিয়েছে। মফঃস্বল-বার্তায় তার খবরের সঙ্গেও বেরোল যে, সে-বুড়ি নাকি দেখেছে, আকাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা কি জিনিস নেমে তার বাছুরকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

বন্ধু অশোক রায়ের বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম সেদিন সকালবেলা। এই খবরটা হঠাৎ চোখে পড়ায় হেসে উঠে অশোককে বললাম—'খবরটা দেখেছো? এরপর কোনদিন শুনব, আকাশ থেকে কি একটা নেমে কার হেঁসেল থেকে মাছ-ভাজা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। আমাদের দেশে একটা কিছু হুজুগ হলেই হলো।'

অশোক রায় কাগজটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে খবরটার ওপর চোখ বুলিয়ে কিন্তু গম্ভীর মুখেই বললে—'হুঁ, আমি আশ্চর্য হচ্ছি শুধু আই. এন: এ. বা আর কেউ এ-সম্বন্ধে কিছু এখনো করছে

না দেখে।'

ঠাট্টা করেই বললাম—'বেশ তো, তোমার তো নিজেরই প্লেন রয়েছে। তুমিই এ-আজগুবি এরোপ্লেনের রহস্য ভেদ করবার জন্যে লাগো না?'

ঠাট্টা ক'রে যে কথা বলেছিলাম, অশোক অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তার যা উত্তর দিলে, তা শুনে প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

অশোক বললো—'লাগবোই তো ঠিক করেছি।'

খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়ে সত্যিই কথা বেরুল না। তারপর অস্ফুটস্বরে বললাম—'তুমি পরিহাস করছ নিশ্চয়ই?'

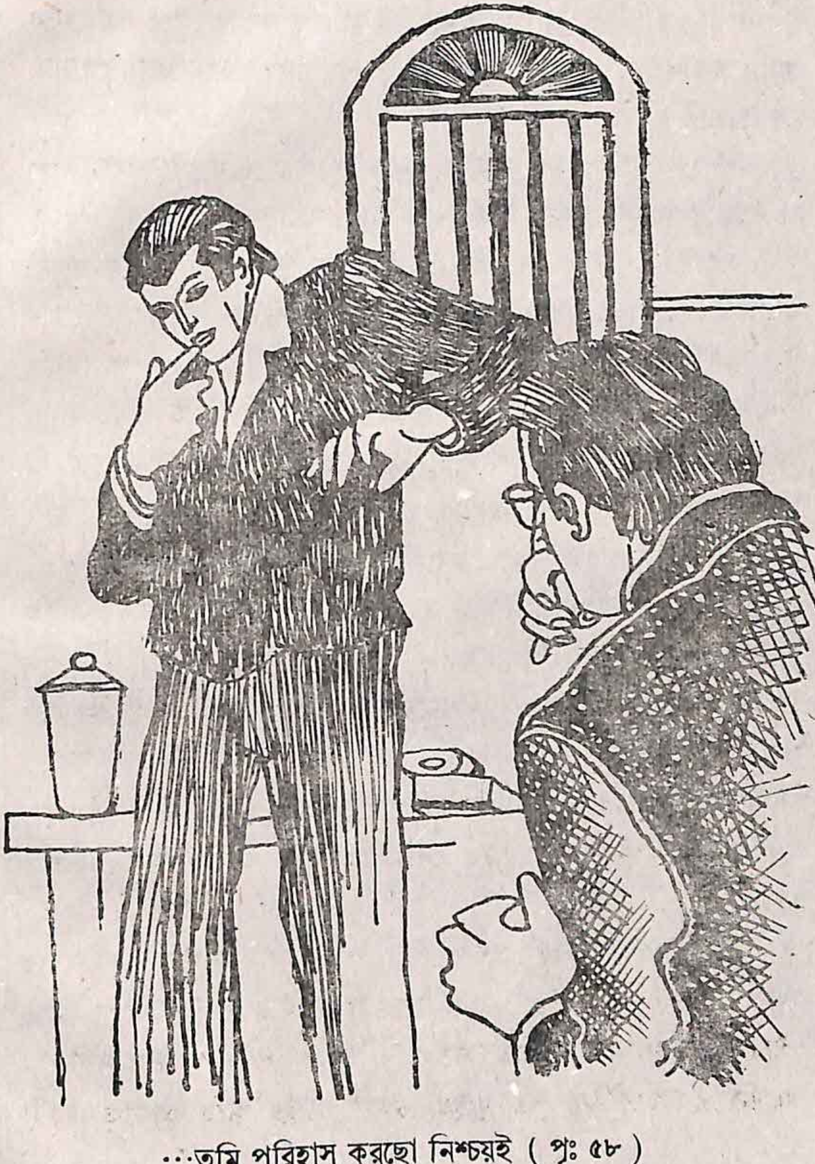
'না, পরিহাস নয়, সত্যিই আমি যাবো ঠিক করেছি এবং আজই।'

আমি এবার ব্যাকুল স্বরে বললাম—'কিন্তু তুমি সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? এ পর্যন্ত কতজন বৈমানিক মারা গেছে জানো? তাদের মধ্যে ওস্তাদ সমস্ত বিমানবীরও ছিল। তুমি তো সবে সেদিন 'বি' সার্টিফিকেট পেয়েছ। তা ছাড়া তোমার প্লেনও ডাকের উড়ো-জাহাজগুলির তুলনায় অনেক খারাপ।'

অশোক বললে—'বিপদ আছে জেনেই তো যাচ্ছি।'

আমি আর একবার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—'বিপদ যে কতখানি, তা কিন্তু তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না। এই রহস্যময় এরোপ্লেনগুলি যারা চালাচ্ছে, তারা যেমন পৈশাচিকভাবে নিষ্ঠুর, তেমনি ধূর্ত ও শক্তিমান। আই. এন. এ. কিছু করছে না, এমন তো নয়; তারা দল বেঁধেও কিছু করতে পারছে না এদের বিরুদ্ধে। তারা যেখানে অক্ষম, তুমি সেখানে একলা কি করতে পার!'

অশোককে কিন্তু নিরস্ত করা গেল না, সে শুধু অদ্ভুত একটা উত্তর দিলে—'হয়তো আই, এন, এ,-র চেয়ে আমি এ-ব্যাপারের মর্ম বেশি



···তুমি পরিহাস করছো নিশ্চয়ই (পৃঃ ৫৮)

বুঝি। অন্তত কোথায় তাদের দেখা পাব, তা আমি জানি।'

তার কাছ থেকে আর কোনো কথা না বের করতে পেরে অবশেষে আমি হতাশ হয়ে বললাম—'নেহাৎই যখন যাবে, তখন আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ছিনে।'

অশোক খানিকক্ষণ আমার দিকে নীরবে চেয়ে থেকে বললে—'এ প্রস্তাব আমি তোমার কাছ থেকে আশা করছিলাম।'

সেইদিন দুপুরেই অশোকের প্লেনে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হলাম। অশোকের প্লেনটি খুব দামী নয়, কিন্তু বেশ মজবুত। টেনে টুনে তাকে ঘণ্টায় ১৭৫ মাইলও চালানো যায়। সামনে অশোকের ও পেছনে আমার সীট। অশোকের অনুরোধে একটি রাইফেল ও একটি রিভলভার নিয়ে আমায় উঠতে হয়েছে। এ ছাড়া আরেকটি জিনিস সে যে কেন সঙ্গে আনতে বলেছিল, কিছুই বুঝতে পারি নি। সেটি একটি লোহার শিরস্ত্রাণ, মধ্যযুগের ধরনে তৈরি। আই. এন. এ. রাত্রে এরোপ্লেন চালানো নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছে, সেইজন্যে আমরা ঠিক করেছিলাম—প্রথমে গন্তব্যস্থানে দিনের বেলা পৌঁছে গোপনে রাত্রে কাজ আরম্ভ করব। গন্তব্যস্থান অবশ্য আমার জানা ছিল না। উত্তরদিকে যাত্রা ক'রে ঘণ্টাকয়েক বাদে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরকোটায় পৌঁছে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত জায়গা থাকতে এই শহরটিকে অশোকের বেছে নেওয়ার কারণ তখনো আমি বুঝতে পারি নি।

কিন্তু নাগরকোটার প্রধান অসুবিধা হলো এরোপ্লেন নামবার জায়গা নিয়ে। দিনের বেলা নগরের বাইরে যে ফুটবলের মাঠে আমরা নেমেছিলাম, রাত্রে অন্ধকারে তাতে অবতরণ করা অসম্ভব। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দূরের একটি গাঁয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা

বাঁজা মাঠ পাওয়া গেল, কিন্তু জোরালো আলোর বন্দোবস্ত করতে না পারার দরুণ প্রথম রাত্রে আমাদের কিছু করা হলো না। দ্বিতীয় রাত্রে যথাসম্ভব জোরালো দু'টি পেট্রলের আলো মাঠের দু'ধারে চিহ্ন-হিসেবে রেখে মাঝরাতে আমরা আকাশে উঠলাম।

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা কোনোদিন বোধহয় ভুলতে পারব না। উত্তেজনার ঝোঁকে এতদূর এগিয়ে এলেও সেই সময়ে মনে যে একটু দ্বিধা না হয়েছিল, এমন নয়। যে রহস্যময় শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা অভিযান করছি, তাদের নৃশংসতার ও শক্তির পরিমাণ আমাদের অজানা নয়। নিজেদের সামান্য শক্তি নিয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারব! মনে হচ্ছিল, এ শুধু গোঁয়ার্তুমি ক'রে মৃত্যুকে ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু তখন আর পেছুবার সময় নেই।

জয়স্টিক টেনে সঙ্গে সঙ্গে গর্জন ক'রে এরোপ্লেন তখন মাটি ছাড়িয়ে উঠেছে। একটিমাত্র ক্ষীণ আশা তখনো মনের মধ্যে আছে— হয়তো সত্যিই আমরা কোনো কিছুর দেখা পেয়েও যেতে পারি, কিন্তু সে আশাও সফল হওয়ার নয়।

দেখতে দেখতে এরোপ্লেন কয়েকবার পাক খেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে পড়ল। নাগরকোটা শহরের ক্ষীণ আলো দূরে থাকায় আমাদের নামবার মাঠের চড়া আলোও তখন প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যা-কিছু আলো আমাদের মাথার ওপর। সেখানে তারায়-ভরা আকাশ ঝলমল করছে। শুক্লপক্ষের দশমী না একাদশী তিথির ভাঙা চাঁদের সামান্য একটু লাল্‌চে রেখা পশ্চিমের দিগন্তে দেখা যাচ্ছিল। মাটির ওপর থেকে সে-চাঁদ অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা অনেক উঁচুতে উঠেছিলাম বলে এখনো তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে-রেখাও

খানিক বাদে মুছে গেল। তারাগুলির আলো ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। নিচে সমস্ত পৃথিবীর ওপর গাঢ় কালির ছোপ। সে-ছোপ কোথাও কোথাও বেশি গাঢ়, কোথাও বা একটু ফিকে। সেই সামান্য একটু রঙের তারতম্য থেকেই আমরা মাঠ, গ্রাম ও জঙ্গলকে যথাসম্ভব আলাদা ক'রে ধরতে পারছিলাম।

শহরের ওপর কয়েকবার চক্কর দিয়ে অশোক উত্তরের জঙ্গলের ওপর প্লেন চালিয়ে এনেছিল। আমাদের গতি তখন খুব বেশী নয়; ঘণ্টায় আন্দাজ আশী মাইল বেগে মাটি থেকে হাজার তিনেক ফিট ওপরে আমরা বিশাল বৃত্তাকারে জঙ্গলের ওপর পাক খাচ্ছিলাম। গ্রীষ্মকালে উপযুক্ত বৈমানিকের পোশাক থাকা সত্ত্বেও ঝড়ের মতো যে হাওয়া আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, তাতে শীত করছিল। মোটরের গর্জন ছাডা আর কিছু শব্দ নেই; তারা-খচিত অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই।

খানিকক্ষণ বাদে এই একঘেয়েমিতে যেন বিরক্তি ধরে গেল। মোটরের আওয়াজের ভেতর কথা কইবার সুবিধের জন্যে অশোকের ও আমার বসবার জায়গার মধ্যে চোঙ-লাগানো রবারের নল আমরা লাগিয়ে নিয়েছিলাম। সেই চোঙের ভেতর দিয়ে বললাম—'এরকমভাবে কতক্ষণ ঘুরব। এতে লাভই বা কি?'

অশোক চোঙের ভেতর দিয়ে উত্তর দিলে—'অত অধীর হয়ো না। রাত্রে ওড়ার একটা আনন্দও তো আছে!'

আমার কিন্তু এটাকে ঠিক আনন্দ বলে মনে হচ্ছিল না। যাই হোক, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা বলে চুপ ক'রে গেলাম। তারপর কতক্ষণ যে আমরা সেই একভাবে চক্কর দিয়েছিলাম, তা বলতে পারি না। পুবের আকাশ যখন একটু ফিকে হয়ে আসছে প্রভাতের

সূচনায়, তখন আমার খেয়াল হলো। আবার চোঙের ভেতর দিয়ে বললাম—'সকাল তো হতে চলল। আর কতক্ষণ ঘুরবে এমন ক'রে ?'

চাপা উত্তেজিতকণ্ঠে জবাব এল—'শিগ্‌গির তোমার শিরস্ত্রাণ পরে ফেলে প্রস্তুত হয়ে ব'স।'

সত্যি-সত্যিই সেই কথায় ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে শিউরে দিয়ে গেল।

কম্পিতস্বরে বললাম—'দেখতে পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ, আমাদের দক্ষিণে চেয়ে দেখ। আমি এরোপ্লেনের বেগ বাড়িয়ে আরো ওপরে উঠছি। সেখান থেকে ওদের ওপর ছোঁ মেরে পড়তে চাই—অবশ্য যদি ওদের বেগ আমাদের চেয়ে বেশী না হয়।'

এরোপ্লেন হঠাৎ কাণিক খেয়ে ওপরদিকে নাক তুলে প্রচণ্ডবেগে উর্ধ্বে উঠতে লাগল ; সেই মুহূর্তে আমিও দেখতে পেলাম। অন্ধকার তখনো বেশ গাঢ়, কিন্তু তারই ভেতর দু'টি বিশাল আবছায়া অদ্ভুত মূর্তি বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

কিন্তু এগুলি কি ধরনের এরোপ্লেন! আমি এরকম এরোপ্লেনের কথা কখনও তো শুনি নি। সামনে তার কোনো প্রপেলার আছে কি না, বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু অনেকটা বাদুড়ের ধরনে তাদের দু'ধারে ডানা যে ওঠা-নামা করছিল, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ-পদ্ধতিতে কোনো এরোপ্লেন যে নির্মিত হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না।

এরোপ্লেন-দু'টির আকৃতিও অদ্ভুত। অস্পষ্টভাবে যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম, তাতে মনে হলো, কোনো সাধারণ প্লেনের সঙ্গে তাদের কোনো মিল নেই।

তাদের বেগ বেশি হোক বা না হোক, আশ্চর্য তাদের ঘোরাফেরার কৌশল। সাধারণ এরোপ্লেনকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মোড় ফিরতে হয়, কিন্তু এরা যেন যে-কোনো জায়গা থেকে যেদিকে খুশি হঠাৎ বাঁক নিতে পারে। সামনে যেতে যেতে হঠাৎ ডিগ্‌বাজী খেয়ে সোজা পেছন দিকে যাওয়াও এদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

সবেগে এরোপ্লেন চালিয়েও এই কৌশলের জন্যেই কিছুতেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারছিলাম না। ওপর থেকে তাদের কাছ দিয়ে চিলের মতো ছোঁ মেরে নামবার আগেই তারা অদ্ভুত কৌশলে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল। গুলি করবার মতো নাগালের মধ্যে তাদের কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।

প্রথমে ভেবেছিলাম, তারাও বুঝি দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাতে পারে; কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তারা যেন শুধু কোনোরকমে আমাদের প্লেনের ল্যাজের দিকটা আক্রমণ করবার ফিকির খুঁজছে মনে হলো।

বন্দুক বা কোনো অস্ত্র কেন যে তারা ব্যবহার করে নি, তা অবিলম্বেই বুঝলাম এবং সেইসঙ্গে সত্যিই আতঙ্কে ওই ঝোড়ো হাওয়ার ভেতরেও আমি এতক্ষণে ঘেমে উঠলাম।

পুবের আকাশ ফিকে হতে হতে তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আকাশের তারা ম্লান আর নিচের মাঠ, গ্রাম, জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে আসছে। এমন সময় আমাদের প্লেন তাদের শ'দুয়েক গজের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম—যাদের আমরা এরোপ্লেন ভেবেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষের তৈরি কোনো-প্রকার যন্ত্র নয়, কল্পনাতীত একরকম প্রাণী—অতিবড় দুঃস্বপ্নেও যাদের রূপ ভাবা যায় না। আব্‌ছা অন্ধকারে তাদের অতিকায়

বাদুড়ের মতো দেহ ও হিংস্র দাঁতাল মুখের যে আভাস আমি পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে অতীত বা বর্তমানের কোনো প্রাণীরই মিল নেই।

নিজের চোখকে প্রথমটা বিশ্বাস করা শক্ত হলেও খানিকক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম, ভুল আমার হয় নি। যতই অবিশ্বাস্য হোক সত্যিই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর দু'টি প্রাণীর সঙ্গেই আমাদের আকাশ-যুদ্ধে নামতে হয়েছে।

অশোক নলের ভেতর দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে—'কার সঙ্গে লড়তে হবে, এবার বুঝতে পেরেছ ?'

আমি বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি কি আগে থেকেই জানতে ?'

উত্তর এল—'না, ঠিক জানতাম না বটে, কিন্তু একটু আঁচ করেছিলাম।'

আর আমাদের কোনো কথা হলো না। কথা কইবার আর সময়ও ছিল না। অন্ধকার কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শত্রুদের চেহারা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পরস্পরকে বাগে পাওয়ার জন্যে তখন আকাশে তাদের সঙ্গে আমাদের প্লেনের অদ্ভুত প্রতিযোগিতা চলছে ; কিন্তু প্রতিযোগিতায় আমারই যেন ক্রমশ বেকায়দায় পড়ছিলাম, মনে হচ্ছিল ।

আমাদের এরোপ্লেনের গতি হয়তো তাদের চেয়ে বেশি, কিন্তু তাদের ওড়বার কৌশল আমাদেয় চেয়ে ভালো। আমি এর মধ্যে কয়েকবার দূর থেকে বন্দুক চালিয়েছি, কিন্তু তাতে কিছু সুবিধে হয় নি। পাখার নানারকম কায়দায় উল্টেপাল্টে তারা শুধু আমাদের এড়িয়েই যাচ্ছিল না, দুটোতে আমাদের দু'পাশে সরে গিয়ে আমাদের

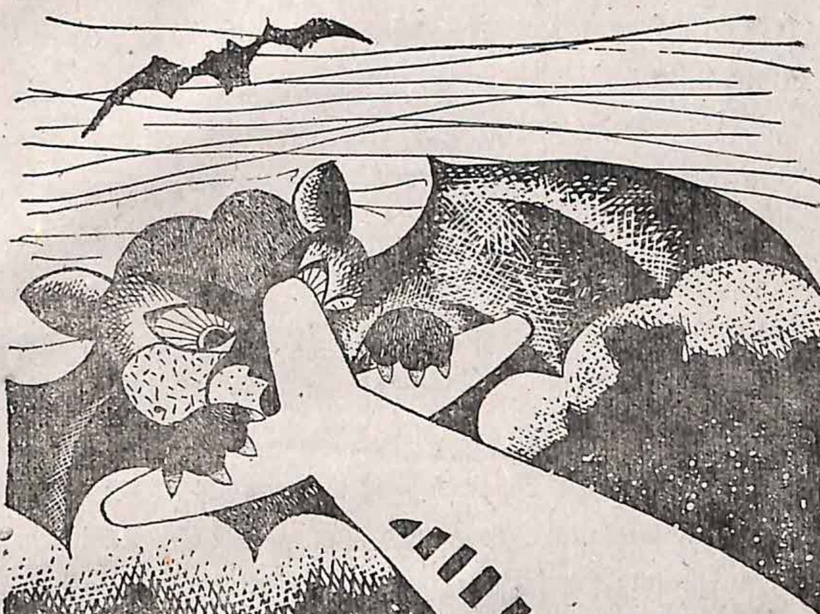
পেছনদিকে আক্রমণ করবার সুযোগ ক'রে নিচ্ছিল।

কিন্তু আক্রমণের কৌশল যে তাদের অমন হবে, আক্রান্ত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তা ভাবতে পারি নি। খানিক আগেই একবার সুবিধে পেয়ে আমি তাদের একটির পাতলা চামড়ার ডানাগুলিতে ফুটো ক'রে দিয়েছিলাম। তাতে সে খুব বেশি জখম হয় নি, কিন্তু যে ভয়ঙ্কর চিৎকার ছেড়েছিল, আমাদের মোটরের গর্জন ছাপিয়েও তা তীক্ষ্ণভাবে আমাদের কানে এসে বিঁধেছে। আমাদের প্লেন একটিকে পাশে রেখে তাদের আরেকটির শ'দুয়েক ফুট তলা দিয়ে এখন যাচ্ছিল। আমি ওপরদিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুকও ছুঁড়েছিলাম। হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে আমাদের প্লেন দুলে উঠে পাক খেতে খেতে নিচের দিকে প্রচণ্ডবেগে পড়তে শুরু করল। প্লেনের সীটের ধারটা সজোরে সে সময়ে ধরে না ফেললে আমি বোধহয় ছিট্‌কেই পড়ে যেতাম।

হলো কি? কি আর হবে। শকুনেরা যেমন ক'রে উঁচু থেকে নামবার সময় পাখা মুড়ে ভারি জিনিসের মতো অনেকদূর থেকে দ্রুতবেগে পড়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে সেই বিশাল প্রাণীটি আমাদের পেছনের পাখার ওপর এসে পড়েছে। এই সুযোগেরই সে অপেক্ষা করছিল।

প্রথমটা সত্যিই আমি বিমূঢ় হয়ে গেছলাম এই আক্রমণের আকস্মিকতায় ও বিপদের ভীষণতায়। হাতের বন্দুকটা তুলে ধরবার কথাও আমার মনে ছিল না। প্লেন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল, বিদ্যুদ্বেগে নিচের মাঠ-ঘাট-জঙ্গল আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মাটিতে আছাড় খেয়ে যখন মরতেই হবে, তখন আর বন্দুক ছুঁড়ে লাভ কি।

কিন্তু সে-বিমূঢ়তা আমার কেটে গেল অশোকের কথায়। সে



···পেছনের পাখার ওপরে এসে পড়েছে (পৃঃ ৬৬)

তাহলে মাথা ঠিক রেখেছে এত বিপদের ভেতরও। চোঙের ভেতর দিয়ে সে চিৎকার ক'রে বললে—'দেখছ কি ? গুলি কর, আমি প্লেন সামলে নিচ্ছি।'

এইবার সামনে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলাম। সেদিকে চেয়ে অবশ্য মাথা ঠিক রাখা শক্ত। সামনের ও পেছনের পায়ের হিংস্র-নখরে আমাদের প্লেনের পেছনের দিকটা আঁকড়ে ধরে একটু একটু ক'রে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার হিংস্র দাঁতাল মুখ একেবারে আমার সামনে। জানোয়ারটির বর্ণনা করা কঠিন! অতিকায় একটা গোসাপের সামনের পা-দুটো থেকে বাদুড়ের মতো পাতলা চামড়ার ডানা বেরিয়েছে বললে তার খানিকটা বর্ণনা হয়, কিন্তু তার হিংস্র মুখের ও সাপের মতো কুটিল ভয়ঙ্কর চোখের ভীষণতা বোঝানো যায় না।

অশোক সামলাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তখন আমাদের প্লেন পেছনের ল্যাজের ভারে টাল হারিয়ে একেবারে মাটির কাছাকাছি এসে পড়েছে। সেইসময়ে দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ ক'রে আমি বন্দুকের নলটা সেই হিংস্র প্রাণীর একেবারে দাঁতাল মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম এবং তারপরই দুটো ঘোড়াই দিলাম পর পর টিপে।

আর কিছু করবার দরকার হলো না। প্লেনের ওপর একবার একটু নড়ে উঠেই জানোয়ারটা গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে। আমাদের বিমানপোতও মাটিতে আছাড় খেতে খেতে হঠাৎ তীরের মতো ওপরে উঠে গেল ভারমুক্ত হয়ে।

পুবের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। কপালের ঘাম মুছে আমি চোঙের ভেতর দিয়ে বললাম—'এবার তো নামতে হয়!'

অশোক বললে—'না, আরেকটা যে এখনো বেঁচে আছে!'

'কিন্তু আমার বন্দুক যে সেই জানোয়ারটার সঙ্গে পড়ে গেছে!'

'বন্দুক পড়ে গেছে!'—সবিস্ময়ে চিৎকার ক'রে উঠে অশোক খানিক চুপ ক'রে রইল, তারপর আবার বললে—'তাহলেও ফেরা যায় না। এমন সুযোগ আর কখনো পাব কিনা সন্দেহ। এই ভীষণ জানোয়ার বেঁচে থাকলে আরো কত সর্বনাশ করবে, কে জানে! তুমি প্যারাস্যুট দিয়ে নামবার জন্যে প্রস্তুত থাক।'

সে যে কি করতে চায়, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম! আর-একটি জানোয়ারের নাগাল আমরা তখন ধরে ফেলেছি। চারিদিক আলোকিত হয়ে ওঠার দরুন, কিংবা তার সঙ্গীর মৃত্যুতে ভয় পেয়ে কিনা, ঠিক বলা যায় না, সে তখন আক্রমণের বদলে পালাবার ফিকিরই খুঁজছে। বিশাল পাখাগুলো সবেগে আন্দোলিত ক'রে পশ্চিমদিকের ঘন জঙ্গলের দিকেই সে যাওয়ার চেষ্টা করছে মনে হলো।

অশোক হঠাৎ চোঙের ভেতর দিয়ে বললে—'লাফিয়ে পড় এইবার।'

কিন্তু লাফাব কি, আমি তখন অশোকের কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে গেছি। আমাদের প্লেন সোজা সেই জানোয়ারটির দিকে বন্দুকের গুলির মতো ছুটে চলেছে। যন্ত্রপাতি সব ঠিক ক'রে অশোক তার বসবার খোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এবার শুধু সীটের ধারটুকু ধরে বাইরে ঝুলে পড়ল, তার ইঙ্গিতে আমিও তখন তাই করছি; তারপর একটি, দু'টি, তিনটি সেকেণ্ড। তার ইশারায় এবার হাত ছেড়ে দিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। প্যারাস্যুটের বোতাম টেপবার আগেই শুনতে পেলাম, ওপরে ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষের আওয়াজ। আমাদের এরোপ্লেন প্রচণ্ডবেগে গিয়ে জানোয়ারটিকে আঘাত করেছে।

প্যারাস্যুট খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একরকম গায়ের পাশ দিয়েই সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটার মৃতদেহ সশব্দে মাটিতে গিয়ে পড়ল ; আমাদের এরোপ্লেনটি মাতালের মতো তখনো পড়তে পড়তে পাক খাচ্ছে।

নাগরকোটা থেকে ট্রেনে কলকাতায় পৌঁছোবার আগেই আমাদের খবর কিরকমভাবে সেখানে পৌঁছে গেছিল। এই আশ্চর্য জানোয়ারের মৃত্যুর খবরে সেখানে কিরকম চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল ; আই. এন. এ. থেকে আমাদের, বিশেষত অশোককে কিরকম সম্মান করা হয়েছিল, সে-খবর অনেকেরই জানা।

এখানে শুধু আমাদের এই অভিযানের অদ্ভুত পরিণতির কথাটাই বলব।

সে-পরিণতি স্যার চিরঞ্জীবের মুক্তি। শুধু মুক্তি নয়, বৈজ্ঞানিক হিসেবে এই ব্যাপারে তাঁর খ্যাতির পুনরুদ্ধারও হয়ে গেল। প্রাচীন যুগের সরীসৃপ-বংশ যে লোপ পায় নি, তার চাক্ষুষ প্রমাণ তো আমরাই পেয়েছি।

যে ভয়ঙ্কর প্রাণী দু'টিকে মেরেছিলাম, স্যার চিরঞ্জীব নিউগিনি-অভিযান থেকে তাদের ডিম এনে কৃত্রিম উপায়ে অদ্ভুত কৌশলে তাঁর পরীক্ষাগারে ফুটিয়ে তাদের ছানাগুলিকে পালন করেছিলেন একদিন বৈজ্ঞানিক-জগৎকে দেখিয়ে স্তম্ভিত ক'রে দেবেন বলে। সেগুলি নাকি প্রাচীনযুগের 'টেরোড্যাক্টিলের'ই সুদূর বংশধর—আরো হিংস্র, আরো বিশালাকার। জানোয়ারগুলিও আশাতিরিক্তভাবে বেড়ে ওঠে ; কিন্তু একদিন হঠাৎ তাঁর চাকরের অসাবধানতায় তাদের খাঁচা থেকে তারা বেরিয়ে পড়ে বলেই বিপদ হয়। চাকরটিকে অমন নৃশংসভাবে

তারাই হত্যা করেছিল।

তারা ছাড়া পেয়ে কি সর্বনাশ করতে পারে, তা বুঝেই স্যার চিরঞ্জীব বন্দুক নিয়ে এরোপ্লেনে তাদের মারবার জন্যে বেরুচ্ছিলেন। পুলিশ তাঁকে সেই অবস্থায় বাধা দেওয়ায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ ক'রে তিনি একেবারে মৌন হয়ে যান।

খবরের কাগজে যে সংবাদ একদম চাপা পড়ে গিয়েছিল, অশোক স্যার চিরঞ্জীবের সেই খুনের রহস্যের সঙ্গে এই বিমানডাকের রহস্যের যোগসূত্র হঠাৎ একদিন আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার না করলে অবশ্য সবদিক দিয়েই সর্বনাশ হয়ে যেত। আর মফঃস্বল-সংবাদে বুড়ির বাছুর-চুরির যে খবর গাঁজাখুরি বলে আমি পরিহাস করেছিলাম, তার থেকেই কিন্তু জানোয়ার দু'টিকে কোথায় সন্ধান করতে হবে, অশোক তার আভাস পায়। নইলে নাগরকোটার নামও সে জানতো না দু'দিন আগে।
